অন্যভুবন

হুমায়ূন আহমেদ

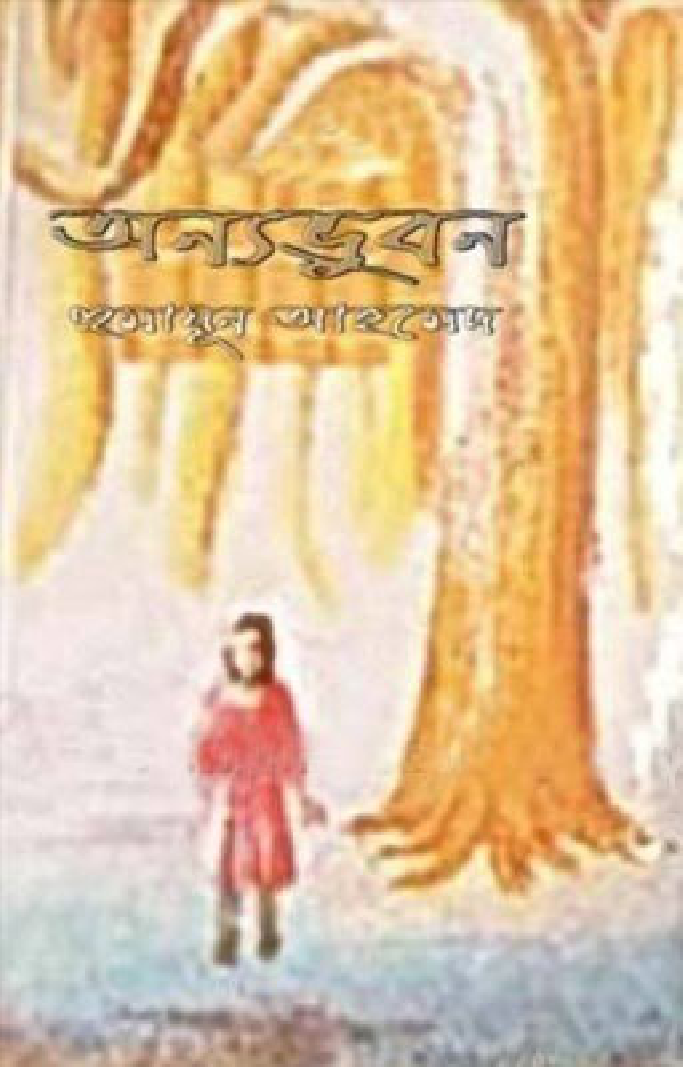

অন্যভুবন

১

দুপুরবেলা কাজের মেয়েটি মিসির আলিকে ডেকে তুলল। কে নাকি দেখা করতে এসেছে। খুব জরুরি দরকার।

মিসির আলির রাগে গা কাঁপতে লাগল। কাজের মেয়েটিকে বলে দেয়া ছিল কিছুতেই যেন তাঁকে তিনটার আগে ডেকে তোলা না হয়। এখন ঘড়িতে বাজছে দু'টা দশ। যত জরুরি কাজই থাকুক, এই সময় তাঁকে ডেকে তোলার কথা নয়। মিসির আলি রাগ কমাবার জন্যে উল্টো দিকে দশ থেকে এক পর্যন্ত গুনলেন। গুন-গুন করে মনে-মনে গাইলেন—আজি এ বসন্তে এত ফুল ফোটে এত পাখি গায়—। এই গানটি গাইলে তাঁর রাগ আপনাতেই কিছুটা নেমে যায়। কিন্তু আজ নামছে না। কাজের মেয়েটির ভাবলেশহীন মুখ দেখে তা আরো বেড়ে যাচ্ছে। তিনি গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'রেবা।'

'জ্বি।'

'আর কোনো দিন তুমি আমাকে তিনটার আগে ডেকে তুলবে না।'

'জ্বি আইচ্ছা।'

'দুটো থেকে তিনটা এই এক ঘন্টা আমি প্রতি দিন দুপুরে ঘুমিয়ে থাকি। এর নাম হচ্ছে সিয়াস্তা। বুঝলে?'

'জ্বি।'

'ঘড়ি দেখতে জান?'

'জ্বি-না।'

মিসির আলির রাগ দপ করে নিভে গেল। যে-মেয়ে ঘড়ি দেখতে জানে না, সে তাকে তিনটার সময় ডেকে তুলবে কীভাবে? রেবা মেয়েটি নতুন কাজে এসেছে। তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে হবে।

'রেবা।'

'জ্বি?'

'আজ সন্ধ্যার পর তোমাকে ঘড়ি দেখা শেখাব। এক থেকে বার পর্যন্ত সংখ্যা প্রথম শিখতে হবে। ঠিক আছে?'

'জ্বি, ঠিক আছে।'

'এখন বল, যে-লোকটি দেখা করতে এসেছে, সে কেমন?'

রেবা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মানুষ মানুষের মতোই, আবার কেমন হবে! তার এই সাহেব কী-সব অদ্ভুত কথাবার্তা যে বলে। পাগলা ধরনের কথাবার্তা।

'বল বল, চুপ করে আছ কেন?'

মিসির আলি বিরক্ত হলেন। এই মেয়েকে কাজ শেখাতে সময় লাগবে। তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, 'মানুষকে দেখতে হবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, বুঝতে পারছ?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল। মাথা নাড়ার ভঙ্গি থেকেই বলে দেয়া যায়, সে কিছুই বোঝে নি। বোঝার চেষ্টাও করে নি। সে শুধু ভাবছে, এই লোকটির মাথায় দোষ আছে। তবে দোষ থাকলেও লোকটা ভালো। বেশ ভালো। রেবা এ-পর্যন্ত দু'টি গ্লাস, একটা পিরিচ এবং একটা প্লেট ভেঙেছে। একটা কাপের বোঁটা আলগা করে ফেলেছে। সে তাকে কিছুই বলে নি। একটা ধমক পর্যন্ত দেয় নি। ভালো মানুষগুলি একটু পাগল-পাগলই হয়ে থাকে।

মিসির আলি হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট নিলেন। একটি সিগারেট বের করে হাত দিয়ে গুঁড়ো করে ফেললেন। তিনি সিগারেট ছাড়বার চেষ্টা করছেন। যখনই খুব খেতে ইচ্ছা করে, তিনি একটি সিগারেট বের করে গুঁড়ো করে ফেলেন, এবং ভাবতে চেষ্টা করেন একটি সিগারেট টানা হল। এতে কোনো লাভ হচ্ছে না, শুধু মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যাচ্ছে।

'রেবা।'

'জ্বি?'

'এখন আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব, তুমি উত্তর দেবে। তোমার উত্তর থেকে আমি ধারণা করতে পারব, যে-লোকটি এসেছে সে কী রকম।'

রেবা হাসল। তার বেশ মজা লাগছে।

'প্রথম প্রশ্ন, যে লোকটি এসেছে সে গ্রামে থাকে না শহরে?'

'গেরামে।'

'লোকটি বুড়ো না জোয়ান?'

'জোয়ান।'

'রোগা না মোটা?'

'রোগা।'

'কী কাপড় পরে এসেছে?'

'মনে নাই।'

'কাপড় পরিষ্কার না ময়লা?'

'ময়লা।'

'হাতে কী আছে? ব্যাগ বা ছাতা, এ-সব কিছু আছে?'

'না।'

'চোখে চশমা আছে?'

'না।'

মিসির আলি থেমে-থেমে বললেন, 'তোমাকে যে-প্রশ্নগুলি করলাম, সেগুলি মনে রাখবে। কেউ আমার কাছে এলে, আমি এইগুলি জানতে চাই। বুঝতে পারছ?'

'জ্বি।'

'এখন যাও, আমার জন্যে এক কাপ চমৎকার চা বানাও। দুধ-চিনি কিচ্ছু দেবে না। শুধু লিকার। বানানো হয়ে গেলে চায়ের কাপে এক দানা লবণ ফেলে দেবে।'

'লবণ?'

'হ্যাঁ, লবণ।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। বসার ঘরে যে-লোকটি এসেছে তাকে দেখা দরকার। রেবার কথামতো লোকটি হবে গ্রামের, ময়লা কাপড় পরে এসেছে। জোয়ান বয়স। হাতে কিছুই নেই। এই ধরনের এক জন লোকের তাঁর কাছে কী প্রয়োজন থাকতে পারে?

বসার ঘরে যে লোকটি বসে ছিল, সে রোগা নয়। পরনে গ্যাভার্ডিনের স্যুট। হাতে চামড়ার একটি ব্যাগ। বয়স পঞ্চাশের উপরে। চোখে চশমা। মিসির আলি মনে-মনে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। রেবা মেয়েটির পর্যবেক্ষণশক্তি মোটেই নেই। একে বেশি দিন রাখা যাবে না। মিসির আলি বসে-থাকা লোকটিকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগলেন।

তিনি ঘরে ঢোকার সময় লোকটি উঠে দাঁড়ায় নি। দাঁড়াবার মতো ভঙ্গি করেছে। বসে থাকার মধ্যেও একটা স্পর্ধার ভাব আছে। লোকটি তাকিয়ে আছে সরু চোখে। যেন সে কিছু একটা যাচাই করে নিচ্ছে। মিসির আলি বললেন, 'ভাই, আপনার নাম?'

'আমার নাম বরকতউল্লাহ্‌। আমি ময়মনসিংহ থেকে এসেছি।'

'কোনো কাজে এসেছেন কি?'

'হ্যাঁ, কাজেই এসেছি। আমি অকাজে ঘোরাঘুরি করি না।'

'আমার কাছে এসেছেন?'

'আপনার কাছে না-এলে, আপনার ঘরে বসে আছি কেন?'

'ভালোই বলেছেন। এখন বলুন, কী ব্যাপার। অল্প কথায় বলুন।'

বরকতউল্লাহ্‌ সাহেব থমথমে গলায় বললেন, 'আমি কথা কম বলি। আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না।'

তিনি লক্ষ করলেন, লোকটি আহত হয়েছে। তার চোখ-মুখ লাল। মিসির আলি খুশি হলেন। লোকটি বড় বেশি স্পর্ধা দেখাচ্ছে।

'বরকতউল্লাহ্‌ সাহেব, চা খাবেন?'

'জ্বি না, আমি চা খাই না। আমার যা বলার তা আমি খুব অল্প কথায় বলে চলে যাব।'

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'অল্প কথায় কিছু বলতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনার অভ্যাস হচ্ছে বেশি কথা বলা। আপনি চা খাবেন কি না, তার জবাব দিতে গিয়ে একটি দীর্ঘ বাক্য বলেছেন। আপনি বলেছেন—জ্বি না, আমি চা খাই না। আমার যা বলার তা আমি খুব অল্প কথায় বলে চলে যাব। এই বাক্যটিতে

সতেরটি শব্দ আছে।'

বরকতউল্লাহ সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন। তাঁর ভ্রু কুঞ্চিত হল। মিসির আলি মনে-মনে হাসলেন। কাউকে বুদ্ধির খেলায় হারাতে পারলে তাঁর খুব আনন্দ হয়।

'বরকতউল্লাহ্ সাহেব, আপনি কী চান?'

'আপনার সাহায্য চাই। তার জন্যে আমি আপনাকে যথাযথ সম্মানী দেব। আমি ধনাঢ্য ব্যাক্তি না-হলেও দরিদ্র নই! আমি চেকবই নিয়ে এসেছি।'

ভদ্রলোক কোটের পকেটে হাত দিলেন। মিসির আলির খানিকটা মন-খারাপ হয়ে গেল। ধনবান ব্যক্তিরা দরিদ্রের কাছে প্রথমেই নিজেদের অর্থের কথা বলে কেন ভাবতে লাগলেন।

বরকতউল্লাহ্ বললেন, 'আমি কি আমার সমস্যাটার কথা আপনাকে বলব?'

মিসির আলি বললেন, 'তার আগে জানতে চাই, আপনি আমার নাম জানলেন কী করে? আমি এমন কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নই যে, ময়মনসিংহের এক জন লোক আমার নাম জানবে।'

বরকতউল্লাহ্ নিচু স্বরে বললেন, 'আমি খুঁজছি এক জন ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট, যাঁর কাছে আমি অকপটে আমার কথা বলতে পারব। যে আমার কথায় লাফিয়ে উঠবে না, আবার অবিশ্বাসের হাসিও হাসবে না। আমি জানি, আপনি সে-রকম এক জন মানুষ। কী করে জানি, তা তেমন জরুরি নয়।'

মিসির আলির মনে হল লোকটা বেশ বুদ্ধিমান, গুছিয়ে কথা বলতে জানে। যার মানে হচ্ছে, গুছিয়ে কথা বলার অভ্যেস তার আছে। লোকটি সম্ভবত এক জন ব্যবসায়ী। সফল ব্যবসায়ীদের নানান ধরনের লোকজনের সঙ্গে খুব গুছিয়ে কথা বলতে হয়।

'বরকতউল্লহ্ সাহেব, আপনি কি এক জন ব্যবসায়ী?'

'হ্যাঁ, আমি এক জন ব্যবসায়ী।'

'কত দিন ধরে ব্যবসা করছেন?'

'প্রায় দশ বছর। এখন করছি না।'

'কিসের ব্যবসা?'

'আপনি আমাকে জেরা করছেন কেন বুঝতে পারছি না।'

'আপনার সমস্যা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব কি না, তা জানার জন্যে জেরা করছি। যদি আপনাকে আমার পছন্দ হয়, তবেই আপনার কথা শুনব। সবার সমস্যা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

'যথেষ্ট পরিমাণ টাকা পেলেও না?'

'না। আমার সম্পর্কে ভালোরকম খোঁজখবর আপনি নেন নি। যদি নিতেন, তাহলে জানতেন যে, আমি টাকা নিই না।'

বরকতউল্লাহ্ সাহেব দীর্ঘ সময় চুপ করে রইলেন। তিনি তাঁর সামনে বসে থাকা রোগাটে লোকটিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। কথাবার্তা বলছে অহঙ্কারী মানুষের মতো, কিন্তু বলার ভঙ্গিটি সহজ ও স্বাভাবিক।

'আপনি টাকা নেন না কেন, জানতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই পারেন। টাকা নিলেই এক ধরনের বাধ্যবাধকতা এসে পড়ে। আমি তার

মধ্যে যেতে চাই না। অন্যের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা আমার পেশা নয়, শখ। শখের ব্যাপারে কোনোরকম বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। কি বলেন?'

'ঠিকই বলছেন। আমি আপনার সব প্রশ্নের জবাব দেব। কী জানতে চান বলুন?'

'আপনার পড়াশোনা কতদূর?'

'এম এ পাশ করেছি। পলিটিক্যাল সায়েন্স।'

'আপনি বলছেন ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন, কেন?'

'এই প্রশ্নের জবাব আপনাকে পরে দেব। অন্য প্রশ্ন করুন।'

'আপনি বিবাহিত?'

'হ্যাঁ। আমার ন' বছর বয়েসী একটি মেয়ে আছে।'

'আপনার সমস্যা এই মেয়েকে নিয়েই, নয় কি?'

'জ্বি হাঁ। কী করে বুঝলেন?'

'মেয়ের কথা বলার সময় আপনার গলার স্বর পাল্টে গেল, তা থেকেই আন্দাজ করছি। আপনার স্ত্রী মারা গেছেন কত দিন হল?

'প্রায় নয় বছর হল। স্ত্রী মারা গেছেন, সেটা কী করে বলতে পারলেন?'

'বাচ্চাদের কোনো সমস্যা হলে মা নিজে আসেন। এ ক্ষেত্রে আসেন নি দেখে সন্দেহ হয়েছিল। তা ছাড়া বিপত্নীক মানুষদের দেখলেই চেনা যায়।'

'আমি কি এবার আমার ব্যাপারটা বলব?'

'বলুন।'

'সংক্ষেপে বলতে হবে?'

'না, সংক্ষেপে বলার দরকার নেই। চা দিতে বলি?'

'জ্বি–না, আমি চা খাই না। এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দিতে বলুন, খুব ঠাণ্ডা। তৃষ্ণা হচ্ছে।'

'আমার ঘরে ফ্রীজ নেই। পানি খুব ঠাণ্ডা হবে না।'

ভদ্রলোক তৃষ্ণার্তের মতোই পানির গ্লাস শেষ করে দ্বিতীয় গ্লাস চাইলেন। মিসির আলি বললেন, 'আরেক গ্লাস দেব?'

'আর লাগবে না।'

'আপনি তাহলে শুরু করুন। আপনার মেয়ের নাম কি?'

'তিন্নি।'

'বলুন তিন্নির কথা।'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। সম্ভবত মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছেন। কিংবা বুঝে উঠতে পারছেন না, ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু করবেন। মিসির আলি লক্ষ করলেন, ভদ্রলোকের কপালে সূক্ষ্ম ঘামের কণা জমতে শুরু করেছে। মিসির আলি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, ন' বছর বয়েসী একটি মেয়ের এমন কী সমস্যা থাকতে পারে যা বলতে গিয়ে এমন অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হয়।

'বলুন, আপনার মেয়ের কথা বলুন।'

ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন।

'আমার মেয়ের নাম তিন্নি।...

'ওর বয়স ন' বছর। মেয়ের জন্মের সময় ওর মা মারা যায়। মেয়েটিকে আমি নিজেই মানুষ করি। আমি মোটামুটিভাবে এক জন স্বচ্ছল মানুষ। কাজেই আমার পক্ষে বেশ কিছু কাজের লোকজন রাখা কোনো সমস্যা ছিল না। তিন্নিকে দেখাশোনার জন্যে অনেকেই ছিল। কিন্তু তবু মেয়েটির বেশির ভাগ দায়িত্ব আমিই পালন করেছি। দুধ বানানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো—সবই আমি করতাম। বুঝতেই পারছেন, মেয়েটি আমার খুবই আদরের। সব বাবার কাছেই তাদের ছেলেমেয়ের আদর থাকে, কিন্তু আমার মধ্যে বাড়াবাড়ি রকমের ছিল।'

মিসির আলি বললেন, 'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, এখন নেই?'

ভদ্রলোক এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। তাঁর মেয়ের কথা বলে যেতে লাগলেন। তিনি এমন একটি ভঙ্গি করলেন, যেন প্রশ্নটি শুনতে পান নি।

'তিন্নির বয়স যখন এক বৎসর, তখন লক্ষ করলাম, ও অন্যান্য শিশুদের মতো নয়। সাধারণত এক বৎসর বয়সেই শিশুরা কথা বলতে শুরু করে। তিন্নির বেলা তা হল না। সে কথা বলা শিখল না। বড়-বড় ডাক্তাররা সবাই দেখলেন। তাঁরাও কোনো কারণ বের করতে পারলেন না। মেয়েটি কানে শুনতে পায়। তার ভোকাল কর্ড ঠিক আছে। কিন্তু কথা বলে না। কেউ কিছু বললে মন দিয়ে শোনে--এই পর্যন্তই। ···

'ই এন টি স্পেশালিস্ট প্রফেসর আলম বললেন, অনেক বাচ্চাই দেরিতে কথা শেখে। এর বেলাও তাই হচ্ছে। দেরি হচ্ছে। আপনি আপনার মেয়ের সঙ্গে দিন-রাত কথা বলবেন। ও শুনে-শুনে শিখবে। ···

'আমি প্রফেসর আলমের পরামর্শমতো প্রচুর কথা বলতাম। গল্প পড়ে শোনাতাম। সিনেমায় নিয়ে যেতাম। কিন্তু কোনো লাভ হল না। মেয়েটি একটি কথাও বলল না। ··

'ওর যখন ছ' বছর বয়স তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। দিনটি আমার পরিষ্কার মনে আছে--জুলাই মাসের তিন তারিখ, শুক্রবার। আমি দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমুচ্ছি। শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। জ্বরজ্বর ভাব। হঠাৎ তিন্নি আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে জাগাল, এবং পরিষ্কার গলায় বলল, ''বাবা, অসময়ে ঘুমুচ্ছ কেন?" ···

'আপনি বুঝতেই পারছেন আমি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। প্রথমে ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি। তিন্নি কথা বলেছে। একটি দু'টি শব্দ নয়, পুরো বাক্য বলেছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলেছে। কোনো রকম জড়তা নয়, অস্পষ্টতা নয়। বিস্ময় সামলাতে আমার দীর্ঘ সময় লাগল। আমি এক সময় বললাম, "তুই কথা বলা জানিস?" ···

'তিন্নি হাসি মুখে বলল, "হ্যাঁ। কেন জানব না?" ···

''এত দিন কথা বলিস নি কেন?'' ···

'তিন্নি তার জবাব দিল না। ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল, যেন সে খুব মজা পাচ্ছে। এটা যেন চমৎকার একটা রসিকতা, কথা না-বলে বাবাকে বোকা বানানো।–

'মিসির আলি সাহেব, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, নতুন এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে আমার সময় লাগল। তবে আমি ঠাণ্ডা ধরনের মানুষ। আমি কোনো কিছু নিয়েই হৈচৈ শুরু করি না। প্রথমে নিজে বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু তিন্নির ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝলাম না। হঠাৎ করে কথা বলা শুরু করা ছাড়াও তার মধ্যে অনেক বড় ধরনের অস্বাভাবিকতা ছিল।'

এই পর্যন্ত বলেই বরকতউল্লাহ্ সাহেব থামলেন। পানি খেতে চাইলেন। মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। বরকতউল্লাহ্ সাহেব নিচু গলায় আবার কথা শুরু করলেন।

'আমি লক্ষ করলাম, তিন্নি সব প্রশ্নের জবাব জানে।'

মিসির আলি বললেন, 'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। সব প্রশ্নের জবাব জানে মানে?'

'আপনাকে উদাহরণ দিলে ভালো বুঝবেন। ধরুন, আমি তিন্নিকে জিজ্ঞেস করলাম, ষোলর বর্গমূল কত? সে এক মুহূর্ত ইতস্তত না-করে বলবে ''চার''—যদিও সে অঙ্কের কিছুই জানে না। যে-মেয়ে কথা বলতে পারে না, তাকে অঙ্ক শেখানোর প্রশ্নই ওঠে না। ···

'আপনাকে আরেকটি উদাহরণ দিই। এক দিন বাসায় ফিরে তিন্নিকে জিজ্ঞেস করলাম, "বল তো মা আজ নয়াবাজারে কার সঙ্গে দেখা হয়েছে?" সে সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "হালিম সাহেবের সঙ্গে।" ···

'হালিম আমার বাল্যবন্ধু। তিন্নি তাকে চেনে না। তার সঙ্গে আমার মেয়ের কোনো দিন দেখা হয় নি। হালিমের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, এটা তিন্নির জানার কোনো কারণ নেই। মিসির আলি সাহেব, বুঝতেই পারছেন, আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তার কিছুদিন পর আরেকটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। ···

'রাতের বেলা তিন্নিকে নিয়ে খেতে বসেছি। হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিসিটি চলে গেল। আমি হারিকেন জ্বালানোর জন্যে বললাম। কেউ হারিকেন খুঁজে পেল না। প্রয়োজনের সময় কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। টর্চ আনতে বললাম--তাও কেউ পাচ্ছে না। আমি বিরক্ত হয়ে ধমকাধমকি করছি। তখন তিন্নি বলল, ''বাতি চলে গেলে সবাই এত হৈচৈ করে কেন?'' ···

আমি বললাম, ''অন্ধকার হয়ে যায়, তাই।'' ···

''অন্ধকার হলে কী অসুবিধা?'' ···

''অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, সেটাই অসুবিধা।'' ···

''তুমি দেখতে পাও না?'' ···

''শুধু আমি কেন, কেউই পায় না। আলো ছাড়া কিছুই দেখা যায় না মা।''···

'তিন্নি খুবই অবাক হল, বিস্মিত গলায় বলল, ''কিন্তু আমি তো অন্ধকারেও দেখতে পাই। আমি তো সব কিছু দেখছি।'' ···

'প্রথম ভাবলাম, সে ঠাট্টা করেছে। কিন্তু না, ঠাট্টা নয়। সে সত্যি কথাই বলছিল। সে অন্ধকারে দেখে। খুব পরিষ্কার দেখে।'

বরকতউল্লাহ্ সাহেব থামলেন। রুমাল বের করে চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে লাগলেন। মিসির আলি বললেন, 'আপনার মেয়ের প্রসঙ্গে আরো কিছু কি বলবেন?' তিনি না-সূচক মাথা নাড়লেন।

'আর কিছুই বলার নেই?'

'আছে। কিন্তু এখন আপনাকে বলতে চাই না।'

'কখন বলবেন?'

'প্রথম আপনি আমার মেয়েকে দেখবেন। ওর সঙ্গে কথা বলবেন। তারপর

আপনাকে বলব।'

'ঠিক আছে। আপনার মেয়ের এখন বয়স হচ্ছে নয়। মেয়ের অস্বাভাবিকাতাগুলি তো আপনার অনেক আগেই চোখে পড়েছে। কোনো ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'না। ডাক্তার এর কী করবে?'

'কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট?'

'না। আপনিই প্রথম ব্যক্তি, যাঁর কাছে আমি এসেছি।'

'মেয়ের এই ব্যাপারগুলি আপনি মনে হচ্ছে লুকিয়ে রাখতে চান।'

'হ্যাঁ, চাই। কেন চাই, তা আপনি আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বললেই বুঝবেন।'

'আপনি মেয়ের মা সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'কী জানতে চান?'

'জানতে চাই তিনি কেমন মহিলা ছিলেন। তাঁর মধ্যে কোনো রকম অস্বাভাবিকতা ছিল কি না।'

'না, ছিল না। তিনি খুবই স্বাভাবিক মহিলা ছিলেন।'

'আপনি ভালোমতো জানেন?'

'হ্যাঁ, ভালোমতোই জানি। আমি এগার বছর আমার স্ত্রীর সঙ্গে কাটিয়েছি। তিন্নি আমাদের শেষ বয়সের সন্তান। এগার বছরে এক জন মানুষকে ভালোমতো জানা যায়

'তা জানা যায়। আচ্ছা, আপনার মেয়ের এই ব্যাপারগুলি কি বাইরের অন্য কাউকে বলেছেন?'

'না, কাউকেই বলি নি। আপনি বুঝতেই পারছেন, এটা জানাজানি হওয়ামাত্রই একটা হৈচৈ শুরু হবে। পত্রিকার লোক আসবে, টিভির লোক আসবে। আমি ভাবলাম, কিছুতেই এটা করতে দেওয়া উচিত হবে না। এখন মিসির আলি সাহেব, দয়া করে বলুন—আপনি কি আমার মেয়েটাকে দেখবেন?'

'হ্যাঁ, দেখব।'

'কবে যাবেন ময়মনসিংহ?'

'আপনি কবে যাবেন?'

'আমি আগামীকাল রাতে যাব। রাত দশটায় একটা ট্রেন আছে—নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস।'

মিসির আলি সহজ স্বরে বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গেই যাব।'

বরকতউল্লাহ্ সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে যাবেন!'

'হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে যাব। কোনো অসুবিধে হবে?'

বরকতউল্লাহ্ সাহেব মাথা নাড়লেন। কোনো অসুবিধা হবে না। এই লোকটিকে তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। যে প্রথমে তাঁর কথাই শুনতে চায় নি, সে এখন—। কত বিচিত্র স্বভাবের মানুষ আছে এই পৃথিবীতে।

২

তিন্নি অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার আগে–আগে। আঁধার হয়ে আসছে। চারদিকে সুনসান নীরবতা। দোতলায় কেউ নেই। কেউ থাকে না কখনো। এ–বাড়ির সব মানুষজন থাকে একতলায়। তিন্নি যখন কাউকে ডাকে, তখনি সে আসে, তার আগে কেউ আসে না। তিন্নির কাউকে ডাকতে ইচ্ছা করছে না। সে জানালার পাশে গিয়ে বসল। এখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। রাস্তা দিয়ে লোকজন যাওয়া–আসা করছে, নানান ধরনের মানুষ। কারোর সঙ্গে কারোর কোনো মিল নেই। কত মজার মজার কথা একেক জন ভাবছে। কিন্তু ওরা কেউ জানে না, তিন্নি সব বুঝতে পারছে। এই তো এক জন মোটা লোক যাচ্ছে। তার হাতে একটা ছাতা। শীতের সময় কেউ ছাতা নিয়ে বের হয়? ছাতাটা কেমন অদ্ভুতভাবে দোলাচ্ছে লোকটা, এবং মনে মনে ভাবছে বাড়ি পৌঁছেই গরম পানি দিয়ে গোসল করে ঘুমুবে। শীতের দিনের সন্ধ্যাবেলায় কেউ ঘুমায়? লোকটার মনে খুব আনন্দ। কারণ সে হঠাৎ করে অনেক টাকা পেয়েছে। কেউ দিয়েছে তাকে। যে দিয়েছে তার নাম রহমত মিয়া।

বুড়ো লোকটি চলে যেতেই রোগা একটা মানুষকে দেখা গেল। সে খুব রেগে আছে। কাকে যেন খুব গাল দিচ্ছে। এমন বাজে গাল যে শুনলে খুব রাগ লাগে। তিন্নি জানালা বন্ধ করে দিল।

ঘরটা এখন অন্ধকার। অন্ধকারে কেউ কিচ্ছু দেখতে পায় না, কিন্তু সে পায়। কেউ অন্ধকারে দেখতে পায় না, সে পায় কেন? সে কেন অন্য মানুষদের মতো নয়? কেন সবাই তাকে ভয় পায়? এই যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কিন্তু কেউ তার কাছে আসছে না। যতক্ষণ সে না ডাকবে, ততক্ষণ আসবে না। এলেও খুব ভয়ে ভয়ে আসবে। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলবে--'তিন্নি আপা, তিন্নি আপা।' এমন রাগ লাগে! রাগ হলে তিন্নির সবাইকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে। তখন তার কপালের বাঁ পাশে চিনচিনে ব্যথা হয়। ব্যথা হলেই রাগ আরো বেড়ে যায়। রাগ বাড়লে ব্যথা বাড়ে। কী কষ্ট! কী কষ্ট!!

তিন্নি দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল এবং রিনরিনে গলায় ডাকল—'নাজিম, নাজিম।' নাজিমের পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সে ভয়ে–ভয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। তিন্নি তাকে দেখতে পাচ্ছে না। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি পেছনের দিকে। কিন্তু তবু তিন্নি পরিষ্কার বুঝতে পারছে, নাজিম রেলিং ধরে–ধরে উপরে আসছে, তার হাতে এক গ্লাস দুধ। নাজিম তার জন্যে দুধ আনছে। কী বিশ্রী ব্যাপার! সে দুধ চায় নি, তবু আনছে। এমন গাধা কেন লোকটা?

'তিন্নি আপা।'

তিন্নি তাকাল না। নাজিম সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। ভয় পাচ্ছে খুব। ভয়ে তার পা কাঁপছে।

'দুধ এনেছেন কেন? দুধ খাব না।'

'অন্য কিছু খাবেন আপা?'

'না, কিচ্ছু খাব না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'বাবা কবে আসবে আপনি জানেন?'

'জানি না, আপা।'

'বাবা কাল সকালে আসবে। একা আসবে না, একটা লোককে নিয়ে আসবে।'

নাজিম কিছু বলল না। তিন্নি কাটা–কাটা গলায় বলল, 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, তাই না?'

'করছি আপা।'

'আমি সব কিছু বুঝতে পারি।'

'আমি জানি আপা।'

'আপনি আমাকে ভয় করেন কেন?'

'আমি ভয় করি না আপা।'

'না, করেন। আপনারা সবাই আমাকে ভয় করেন। আপনি করেন, আবুর মা করে, দারোয়ান করে, সবাই ভয় করে। যান, আপনি চলে যান।'

'দুধ খাবেন না?'

'না, খাব না। কিচ্ছু খাব না।'

'বাতি জ্বালিয়ে দিই?'

'না, বাতি জ্বালাতে হবে না।'

'জ্বি আচ্ছা, আমি যাই আপা?'

'না, আপনি যেতে পারবেন না। আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন।'

নাজিম দাঁড়িয়ে রইল। তিন্নি তার ঘরে ঢুকে ছবি আঁকতে বসল। ঘর এখন নিকষ অন্ধকার, কিন্তু তাতে তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। অন্ধকারেই বরং রঙগুলি পরিষ্কার দেখা যায়। তিন্নি অতি দ্রুত ব্রাশ চালাচ্ছে। ভালো লাগছে না। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। কান্না পাচ্ছে। সে তার রঙগুলি দূরে সরিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

নাজিম ভীত গলায় বলল, 'কী হয়েছে তিন্নি আপা?'

তিন্নি তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'কিচ্ছু হয় নি, আপনি চলে যান।'

নাজিম অতি দ্রুত সিঁড়ি থেকে নেমে গেল। যেন সে পালিয়ে বেঁচেছে।

৩

তাঁরা ময়মনসিংহ এসে পৌঁছলেন ভোররাতে। তখনো চারদিক অন্ধকার। কিছুই দেখার উপায় নেই। মিসির আলির মনে হল, বিশাল একটি রাজপ্রসাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। গাছগাছালিতে চারদিক ঢাকা। বারান্দায় অল্প পাওয়ারের একটি বাতি জ্বলছে। তাতে চারদিকের অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে। মিসির আলি বললেন, 'রাজবাড়ি বলে মনে হচ্ছে।'

বরকত সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'এক সময় ছিল। সুসং দুর্গাপুরের মহারাজার বাড়ি। আমি কিনে নিয়েছি।'

দারোয়ান গেট খোলামাত্র ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। অনেক লোকজন বেরিয়ে এল। সবাই ভৃত্যশ্রেণীর। আজকালকার যুগেও যে এত জন কাজের লোক থাকতে পারে, তা মিসির আলি ধারণা করেন নি। তিনি লক্ষ করলেন, এরা কেউ তিন্নি মেয়েটির উল্লেখ করছে না। মেয়ের বাবাও মেয়ে সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস

করলেন না। অথচ জিজ্ঞেস করাটাই স্বাভাবিক ছিল।

বরকত সাহেব বললেন, 'আপনি যান, বিশ্রাম করুন। সকালবেলা আপনার সঙ্গে কথা হবে।'

কালোমতো লম্বা একটি ছেলে তাঁর ঘর দেখিয়ে দিল।

একতলার একটি কামরা, পুরোনো দিনের কামরাগুলি যেমন হয়--দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিশাল। বিরাট দক্ষিণমুখী জানালা। ঘরের আসবাবপত্র সবই দামী ও আধুনিক। খাটে ছ' ইঞ্চি ফোমের তোষক। রকিং-চেয়ার। মেঝেতে দামী স্যাগ কার্পেট। মফস্বল শহরে এ-সব জিনিস ঠিক আশা করা যায় না।

বাথরুমে ঢুকে মিসির আলি আরো অবাক হলেন। ওয়াটার হিটারের ব্যবস্থা আছে। চমৎকার বাথটাব। মিসির আলির মনে হল, অনেক দিন এ ঘরে বা বাথরুমে কেউ আসে নি। এমন চমৎকার একটি গেস্টরুম এরা শুধু-শুধু বানিয়ে রেখেছে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কিন্তু গরম পানির ব্যবস্থা যখন আছে, তখন একটা হট শাওয়ার নেয়া যেতে পারে। মিসির আলি দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল সারলেন। শরীর ঝরঝরে লাগছে। এক কাপ গরম চা পেলে বেশ হত।

বাথরুম থেকে বের হয়েই দেখলেন টেবিলে চায়ের আয়োজন। পটভর্তি চা, প্লেটে নোনতা বিস্কিট, কুচিকুচি করে কাটা পনির। ভৃত্যশ্রেণীর এক জন যুবক তাঁকে ঢুকতে দেখেই চা ঢালতে শুরু করল। তিনি লক্ষ করলেন, লোকটি আড়চোখে তাঁর দিকে বারবার তাকাচ্ছে। চোখে চোখ পড়ামাত্র চট করে মাথা নামিয়ে নিচ্ছে।

'তোমার নাম কি?'

'নাজিম।'

'শুধু নাজিম?'

'নাজিমুদ্দিন।'

'কত দিন ধরে এ-বাড়িতে আছ?'

'জ্বি, অনেক দিন।'

'অনেক দিন মানে কত দিন?'

'পাঁচ বছর।'

'এ-বাড়িতে ক' জন মানুষ থাকে?'

নাজিম জবাব দিল না। চায়ের কাপে চিনি ঢেলে এগিয়ে দিল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, সে এখন চলে যাবে। মিসির আলি দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়িতে ক' জন মানুষ থাকে?'

'স্যার, আমি কিছু জানি না।'

'আমি কিছু জানি না মানে? তুমি পাঁচ বছর এ বাড়িতে আছ, অথচ জান না এ বাড়িতে ক' জন মানুষ থাকে?'

'জ্বি না স্যার, আমি জানি না।'

'বরকত সাহেব এবং তাঁর মেয়ে— এই দু' জন ছাড়া আর ক' জন মানুষ থাকে?'

'আমি স্যার কিছুই জানি না।'

মিসির আলি বড়ই অবাক হলেন। আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। চায়ে চুমুক

দিলেন। সিগারেট ধরালেন। তিনি সিগারেট ছেড়ে দেবার চেষ্টা করছেন, সেটা মনে রইল না। এই লোকটি কোনো কিছু বলতে চাচ্ছে না কেন? বাধা কোথায়?

নাজিম মৃদুস্বরে বলল, 'স্যার, বিছানায় শুয়ে বেশ্রাম নিবেন?'

'না, আমি অসময়ে ঘুমুব না।'

'সকালের নাশতা দেওয়া হবে সাড়ে সাতটায়।'

'ঠিক আছে।'

'আসি স্যার, পাশের ঘরেই আছি। দরকার হলে কলিং-বেল টেপবেন। দরজার কাছে কলিং-বেল আছে।'

তিনি মাথা নাড়লেন। কিছু বললেন না। ঘড়িতে বাজছে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে। তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ব্রহ্মপুত্র নদী নিশ্চয়ই খুব কাছে। ভোরবেলা নদীর পাড় ধরে হাঁটতে ভালো লাগবে। এই শহরে এর আগে তিনি আসেন নি। অপরিচিত শহরে ঘুরে বেড়াতে চমৎকার লাগে।

গেট বন্ধ। গেটের পাশের খুপরি-ঘরটায় দারোয়ান নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। মিসির আলি উঁচু গলায় ডাকলেন, 'দারোয়ান, দারোয়ান, গেট খুলে দাও।'

দারোয়ান বেরিয়ে এল, কিন্তু গেট খুলল না। যেন সে কথা বুঝতে পারছে না।

'গেট খুলে দাও, আমি বাইরে যাব।'

'গেট খোলা যাবে না।'

'খোলা যাবে না মানে? কেন যাবে না?'

'বড়সাহেবের হুকুম ছাড়া খোলা যাবে না।'

'তার মানে? কী বলছ তুমি? এটা কি জেলখানা নাকি?'

দারোয়ান কোনো উত্তর না-দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। যেন মিসির আলির সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাবার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই।

তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন একা-একা। তাঁর সামনে ভারি লোহার গেট। সমস্ত বাড়িটিকে যে-পাঁচিল ঘিরে রেখেছে, তাও অনেকখানি উঁচু। সত্যি সত্যি জেলখানা-জেলখানা ভাব। মিসির আলি আবার ডাকলেন, 'দারোয়ান—দারোয়ান।' কেউ বেরিয়ে এল না। ভোর সাতটা পর্যন্ত মিসির আলি বাড়ির সামনের বাগানে চিন্তিত মুখে ঘুরে বেড়ালেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করলেন। এই বাড়িটি গাছগাছালিতে ভর্তি। কিন্তু কোনো গাছে পাখি ডাকছে না। শুধু যে ডাকছে না তাই নয়, কোনো গাছে পাখি বসে পর্যন্ত নেই। অথচ ভোরবেলার এই সময়টায় পাখির কিচিরমিচিরে কান ঝালাপালা হবার কথা। অথচ চারদিক কেমন নীরব, থমথমে।

'স্যার, আপনার নাশতা দেয়া হয়েছে।'

'কোথায়?'

'দোতলায়।'

'চল যাই।'

'আমি যাব না স্যার। আপনি একা যান। ঐ যে সিঁড়ি।'

সিঁড়িতে পা রেখেই মিসির আলি থমকে দাঁড়ালেন। সিঁড়ির মাথায় একটি বালিকা দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি দারুণ রূপসী। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল। টানা টানা চোখ। দেবীমূর্তির মতো কাটা-কাটা নাক-মুখ। মেয়েটি

দাঁড়িয়েও আছে মূর্তির মতো। একটুও নড়ছে না। চোখের দৃষ্টিও ফিরিয়ে নিচ্ছে না। মিসির আলি বললেন, 'কেমন আছ তিন্নি?'

মেয়েটি মিষ্টি করে হেসে বলল, 'ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ, ভালোই আছি।'

'আপনাকে গেট খুলে দেয় নি, তাই না?'

মিসির আলি উপরে উঠতে উঠতে বললেন, 'দারোয়ান ব্যাটা বেশি সুবিধার না। কিছুতেই গেট খুলল না।'

'দারোয়ান ভালোই। বাবার জন্যে খোলে নি। বাবা গেট খুলতে নিষেধ করেছেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। বাবার ধারণা, গেট খুললেই আমি চলে যাব।'

'তুমি বুঝি শুধু চলে যেতে চাও?'

'না, চাই না। কিন্তু বাবার ধারণা, আমি চলে যেতে চাই।'

মেয়েটি আবার মাথা দুলিয়ে হাসল। মেয়েটি এই দারুণ শীতেও পাতলা একটা জামা গায়ে দিয়ে আছে। খালি পা। মনে হচ্ছে সে শীতে অল্প অল্প কাঁপছে।

'তিন্নি, তোমার শীত লাগছে না?'

'না।'

'বল কী! এই প্রচণ্ড শীতে তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না?'

'না। আপনি নাশতা খেতে যান। বাবা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। দেরি হচ্ছে দেখে মনে-মনে রেগে যাচ্ছে।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাই।'

মেয়েটি হাঁটতে শুরু করল। ধবধবে সাদা রঙের ফ্রকে তাকে দেবশিশুর মতো লাগছে। মিসির আলি মেয়েটির প্রতি গাঢ় মমতা বোধ করলেন। তাঁর ইচ্ছে করল মেয়েটিকে কোলে তুলে নিতে। কিন্তু এ-মেয়ে হয়তো এ-সব পছন্দ করবে না। একে দেখেই মনে হচ্ছে, এর পছন্দ-অপছন্দ খুব তীব্র।

নাশতার আয়োজন প্রচুর।

রুটি মাখন থেকে শুরু করে চিকেন ফ্রাই, ফিস ফ্রাই সবই আছে। বিলেতি কায়দায় দু' জনের সামনেই এক বাটি করে সালাদ। লম্বা-লম্বা গ্লাসে কমলালেবুর রস। রাজকীয় ব্যাপার। শুধু খাবারদাবার এগিয়ে দেবার জন্যে কেউ নেই। বরকত সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'বসে আছেন কেন? শুরু করুন।'

'তিন্নির জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'ও আসবে না।'

'আসবে না কেন?'

'খেয়ে নিয়েছে। আমার মেয়ের সঙ্গে কি আপনার কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন দেখলেন আমার মেয়েকে?'

'ভালো।'

বরকত সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। নিচু গলায় বললেন,

'ওর মধ্যে কি কোনো অস্বাভাবিকতা আপনার নজরে পড়েছে?"

'না।'

'ভালো করে ভেবে বলুন।'

'ভেবেই বলছি। তবে পারিপার্শ্বিকে কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ করছি।'

'যেমন?'

'যেমন আপনার গাছগুলিতে কোনো পাখি নেই। একটি পাখিও আমার চোখে পড়ে নি।'

বরকত সাহেব চমকালেন না। তার মানে তিনি ব্যাপারটি আগেই লক্ষ করেছেন। আগে লক্ষ না-করলে নিশ্চয়ই চমকাতেন। অর্থাৎ মানুষটির পর্যবেক্ষণ-শক্তি ভালো। এই জিনিসটি চট করে কারোর চোখে পড়বে না। মিসির আলি বললেন, 'এ ছাড়াও অন্য একটি ব্যাপার লক্ষ করেছি।'

'বলুন শুনি।'

'আপনার বাড়ির কাজের লোকটি, যার নাম নাজিম, সে অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত।'

'এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এ-বাড়ির সবাই আমাকে ভয় করে।'

'কেন?'

'পৃথিবীর নিয়মই হচ্ছে ক্ষমতাবানকে ভয় করা। আমি ক্ষমতাবান।'

'ক্ষমতাটা কিসের?'

'অর্থের। অর্থের ক্ষমতাই সবচেয়ে বড় ক্ষমতা।'

'আপনার ধারণা, যেহেতু আপনার প্রচুর টাকা, সেহেতু সবাই আপনাকে ভয় করে?'

'অন্য কারণও আছে, আমি বেশ বদমেজাজি।'

'আপনার মেয়ে তিন্নি, সেও কি বদমেজাজি?'

বরকত সাহেবের ভ্রু কুঁচকে উঠল। তিনি জবাব দিতে গিয়েও দিলেন না। হালকা স্বরে বললেন, 'চা নিন। নাকি কফি খেতে চান?'

'চা খাব। আপনি বলেছিলেন ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন। এখন করেন কী?'

'কিছুই করি না। এখন আমি ঘরেই থাকি।'

'এবং কাউকে ঘর থেকে বেরুতে দেন না।'

'এ-কথা বলছেন কেন?'

'কারণ দারোয়ান আমাকে বেরুতে দেয় নি।'

'ওকে বলে দিয়েছি যেন গেট না খোলে।'

'কেন বলেছেন?'

'তিন্নির জন্যে বলেছি। আমার ভয়, গেট খোলা পেলেই সে চলে যাবে। আমি আর কোনোদিন তাকে ফিরে পাব না।'

'সে কি এর আগে কখনো গিয়েছে?'

'না।'

'তাহলে কী করে আপনার ধারণা হল, গেট খোলা পেলে সে চলে যাবে?'

'আমাকে আপনি এত প্রশ্ন করছেন কেন? আমাকে প্রশ্ন করবার জন্যে তো আপনাকে আনি নি! আপনাকে আনা হয়েছে আমার মেয়ের জন্যে।'

'আনা হয়েছে বলাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। আমি নিজ থেকে এসেছি।'

বরকত সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আপনি দয়া করে আমার মেয়ের ঘরে চলে যান। ওর সঙ্গে কথা বলুন।'

'ও কি তার ঘরে একা থাকে?'

'হ্যাঁ, একাই থাকে।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়াতেই বরকত সাহেব বললেন, 'প্লীজ, একটি কথা মন দিয়ে শুনুন। এমন কিছুই করবেন না, যাতে আমার মেয়ে রেগে যায়।'

'এ কথা বলছেন কেন?'

'ও রেগে গেলে মানুষকে কষ্ট দেয়।'

'কীভাবে কষ্ট দেয়?'

'নিজেই বুঝবেন, আমার বলার দরকার হবে না।'

তিন্নির ঘরটি বিরাট বড়। এক পাশে ছোট্ট একটি কালো রঙের খাটে সুন্দর একটি বিছানা পাতা। নানান ধরনের খেলনায় ঘর ভর্তি। বেশির ভাগ খেলনাই হচ্ছে তুলার তৈরী জীবজন্তু। শিশুদের ঘর যেমন অগোছাল থাকে, এ ঘরটি সে-রকম নয়। বেশ গোছানো ঘর। মিসির আলি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তিন্নিকে দেখলেন। মেয়েটি গভীর মনোযোগে ছবি আঁকছে। এক বারও তাকাচ্ছে না তাঁর দিকে। মিসির আলি বললেন, 'তিন্নি, ভেতরে আসব?'

তিন্নি ছবি থেকে মুখ না-তুলেই বলল, 'আসতে ইচ্ছে হলে আসুন।'

'ইচ্ছে না হলে আসব না?'

তিন্নি কিছু বলল না। মিসির আলি ভেতরে ঢুকলেন। হাসিমুখে বললেন, 'বসব কিছুক্ষণ তোমার ঘরে?'

'বসার ইচ্ছে হলে বসুন।'

তিনি বসলেন। হাসিমুখে বললেন, 'কিসের ছবি আঁকছ?'

'গাছের।'

'দেখি কেমন ছবি?'

'দেখতে ইচ্ছে হলে দেখুন।'

তিন্নি তার ছবি এগিয়ে দিল। মিসির আলি অবাক হয়ে দেখলেন, অদ্ভুত সব গাছের ছবি আঁকা হয়েছে। গাছগুলিতে কোনো পাতা নেই। অসংখ্য ডাল। ডালগুলি লতানো। কিছু কিছু লতা আবার চুলের বেণীর মতো পাকানো।

'সুন্দর হয়েছে তো গাছের ছবি!'

'আপনার ভালো লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'এ-রকম গাছ কি আপনি এর আগে কখনো দেখেছেন?'

'না, দেখি নি।'

'তাহলে আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন না—কী করে আমি না-দেখে এমন সুন্দর গাছের ছবি আঁকলাম?'

'শিশুরা মন থেকে অনেক জিনিস আঁকে।'

তিন্নি হাসল। তিনি প্রথম মেয়েটির মুখে হাসি দেখলেন। তিন্নি হাসতে-হাসতে ভেঙে পড়ছে। মিসির আলি বললেন, 'তুমি এত হাসছ কেন?'

'হাসতে ভালো লাগছে, তাই হাসছি।'

তিনি নিজেও হাসলেন। হাসতে-হাসতেই বললেন, 'আমি শুনেছি তুমি সব প্রশ্নের উত্তর জান।'

'কে বলেছে? বাবা?'

'হ্যাঁ। তুমি কি সত্যি-সত্যি জান?'

'জানি। পরীক্ষা করতে চান?'

'হ্যাঁ, চাই। বল তো নয়-এর বর্গমূল কত?'

'তিন।'

'পাঁচের বর্গমূল কত সেটা জান?'

তিন্নি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি জানি না।'

'আচ্ছা দেখি, এটা পার কি না। পেনিসিলিন যিনি আবিষ্কার করেছেন, তাঁর নাম কি?'

'স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং।'

'হ্যাঁ, হয়েছে। এখন বল দেখি তাঁর স্ত্রীর নাম কি?'

'আমি জানি না।'

'সত্যি জান না?'

'না, আমি জানি না।'

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নবেল প্রাইজ পেয়েছেন জান?'

'জানি। উনিশ শ' তের সালে।'

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট মেয়ের নাম জান?'

'জানি না।'

মিসির আলি হাসতে লাগলেন। তিন্নি ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল। গম্ভীর স্বরে বলল, 'আপনি হাসছেন কেন?'

'আমি হাসছি, কারণ তুমি কীভাবে সব প্রশ্নের জবাব দাও, তা বুঝতে পারছি।'

'তাহলে বলুন, কীভাবে সব প্রশ্নের জবাব দিই।'

'আমি লক্ষ করলাম, যে-সব প্রশ্নের উত্তর আমি জানি, শুধু সে-সব প্রশ্নের উত্তরই তুমি জান। যেমন আমি জানি নয়ের বর্গমূল তিন। কাজেই তুমি বললে তিন। কিন্তু পাঁচের বর্গমূল কত তা তুমি বলতে পারলে না, কারণ আমি নিজেও তা জানি না। আলেকজান্ডার ফ্লেমিংয়ের স্ত্রীর নাম তুমি বলতে পারলে না, কারণ আমি তাঁর স্ত্রী নাম জানি না। ঠিক এইভাবে..........।'

'থাক, আর বলতে হবে না।'

তিন্নি তাকিয়ে আছে। তার মুখে কোনো হাসি নেই। সমস্ত চেহারায় কেমন একটা কঠিন ভাব চলে এসেছে, যা এত অল্পবয়সী একটি বাচ্চার চেহারার সঙ্গে ঠিক মিশ খাচ্ছে না। মিসির আলি সহজ স্বরে বললেন, 'তুমি মানুষের মনের কথা টের পাও। টের পাও বলেই জানা প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পার। এটা এক ধরনের টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা। কেউ-কেউ এ-ধরনের ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়।'

তিন্নি শীতল গলায় বলল, 'আপনি খুব বুদ্ধিমান।'

মিসির আলি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বুদ্ধিমান।'

'আপনি বুদ্ধিমান এবং অহঙ্কারী।'

'যারা বুদ্ধিমান, তারা সাধারণত অহঙ্কারী হয়। এটা দোষের নয়। যে-জিনিস তোমার নেই, তা নিয়ে তুমি যখন অহঙ্কার কর, সেটা হয় দোষের।'

'আপনি এখানে কেন এসেছেন?'

'তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে এসেছি।'

'কিসের সাহায্য?'

'আমি এখনো ঠিক জানি না। সেটাই দেখতে এসেছি। হয়তো তোমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তোমার বাবা শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছেন।'

'আমি ডাক্তার পছন্দ করি না।'

'আমি ডাক্তার নই।'

'আপনি এখন আমার ঘর থেকে চলে যান। আমার আর আপনাকে ভালো লাগছে না।'

'আমার কিন্তু তোমাকে ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে।'

'আপনি এখন যান।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। তিন্নি বলল, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চলে যান।'

তিন্নি কথা ক'টি বলার সঙ্গে-সঙ্গে মিসির আলি তাঁর মাথার ঠিক মাঝখানে এক ধরনের যন্ত্রণা বোধ করলেন। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল, বমিবমি ভাব হল, আর সেই সঙ্গে তীব্র ও তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। যেন কেউ একটি ধারাল ব্লেড দিয়ে আচমকা মাথাটা দু'ফাঁক করে ফেলেছে। মিসির আলি বুঝতে পারছেন, তিনি জ্ঞান হারাচ্ছেন। পৃথিবী তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। চোখের সামনে দেখছেন সাবানের বুদবুদের মতো বুদবুদ। জ্ঞান হারাবার ঠিক আগমুহূর্তে ব্যথাটা কমে গেল। সমস্ত শরীরে এক ধরনের অবসাদ। ঘুমে চোখ জড়িয়ে যাচ্ছে। মিসির আলি তাকালেন তিন্নির দিকে। মেয়েটির ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। সহজ হাসি নয়, উপহাসের হাসি। মিসির আলি দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বললেন, 'এটা তো তুমি ভালোই দেখালে।'

তিন্নি বলল, 'এর চেয়েও ভালো দেখাতে পারি।'

'তা পার। নিশ্চয়ই পার। তুমি কি রাগ হলেই এ রকম কর?'

'হ্যাঁ, করি।'

'আমি তোমাকে রাগাতে চাই না।'

'কেউ চায় না।'

'সবাই তোমাকে খুশি রাখতে চায়?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তবু তুমি প্রায়ই রেগে যাও, তাই না?'

'হ্যাঁ, যাই।'

'রাগটা সাধারণত কতক্ষণ থাকে?'

'ঠিক নেই। কখনো অনেক বেশি সময় থাকে।'

'আচ্ছা তিন্নি, মনে কর এখানে দু' জন মানুষ আছে। তুমি রাগ করলে এক জনের

উপর, তাহলে ব্যথাটা কি সেই জনই পাবে। না দু' জন একত্রে পাবে?'

'যার উপর রাগ করেছি সে-ই পাবে, অন্যে পাবে কেন? অন্য জনের উপর তো আমি রাগ করি নি।'

'তাও তো ঠিক। এখন কি আমার উপর তোমার রাগ কমেছে?'

'হ্যাঁ, কমেছে।'

'তাহলে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাস তো, যাতে আমি বুঝতে পারি তোমার রাগ সত্যি সত্যি কমেছে।'

তিন্নি হাসল। মিসির আলি বললেন, 'আমি কি আরো খানিকক্ষণ বসব?'

'বসার ইচ্ছা হলে বসুন।'

মিসির আলি বসলেন। একটি সিগারেট ধরালেন। মেয়েটি নিজের মনে ছবি আঁকছে। সেই গাছের ছবি, লতানো ডাল, পত্রহীন বিশাল বৃক্ষ। মিসির আলি ঠিক করলেন, তিনি একটি পরীক্ষা করবেন। এই মেয়েটি যেভাবেই হোক, মস্তিষ্কের কোষে সরাসরি চাপ প্রয়োগ করতে পারে। উচ্চ পর্যায়ের একটি টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা। ছোট্ট একটি মেয়ে, অথচ কত সহজে মানুষের মাথায় ঢুকে যাচ্ছে। এটাকে বাধা দেবার একমাত্র উপায় সম্ভবত মেয়েটিকে মাথার ভেতর ঢুকতে না-দেয়া। সেটা করা যাবে তখনই, যখন নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যাবে। সমস্ত চিন্তা ও ভাবনা কেন্দ্রীভূত করা হবে একটি বিন্দুতে।

মিসির আলি ডাকলেন, 'তিন্নি।'

তিন্নি মুখ না তুলেই বলল, 'কি?'

'তুমি আমার মাথার ব্যথাটা আবার তৈরি কর তো।'

'কেন?'

'আমি একটা ছোট্ট পরীক্ষা করব।'

'কী পরীক্ষা?'

'আমি দেখতে চাই এই ব্যথার হাত থেকে বাঁচার কোনো উপায় আছে কি না।'

'উপায় নেই।'

'সেটাই দেখব। তবে তিন্নি একটি কথা, ব্যথাটা তুমি তৈরি করবে খুব ধীরে। এবং যখনই আমি হাত তুলব, তুমি ব্যথাটা কমিয়ে ফেলবে।'

'আপনি খুব অদ্ভুত মানুষ।'

'আমি মোটেই অদ্ভুত মানুষ নই। আমি একজন যুক্তিবাদী মানুষ। আমি এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে।'

'আমার কোনো সাহায্য লাগবে না।'

'হয়তো লাগবে না। তবু আমি তোমার ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে চাই। এখন তুমি ব্যথা তৈরি কর তো। খুব ধীরে-ধীরে।'

তিন্নি মাথা তুলে সোজা হয়ে বসল। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হচ্ছে। ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছে। বাঁকা ঠোঁট খুব হালকাভাবে কাঁপছে।

মিসির আলি চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তিনি তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ একটি ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত করে ফেললেন। খুব ছোটবেলায় তিনি একটি সাপের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এখন তিনি ভাবছেন সেই সাপটির কথা। সাপটির হলুদ গা ছিল চক্রকাটা।

বুকে ভর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছিল। তাঁকে দেখেই সে থমকে গেল। ঘন-ঘন তার চেরা জিব বের করতে লাগল। মিসির আলি এখন আর কিছুই ভাবছেন না। পৃথিবীতে ঠিক এই মুহূর্তে সাপের চেরা জিব ছাড়া অন্য কিছুই নেই। তিনি জীবিত কি মৃত, সেই বোধও তাঁর নেই। তিনি কল্পনায় দেখছেন হলুদ রঙের কুৎসিত সাপের চেরা জিব বাতাসে কাঁপছে।

মিসির আলির চোখের দৃষ্টি ঘোলা হয়ে আসছে। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। তিনি ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছেন। তিন্নি অবাক হয়ে মিসির আলিকে দেখছে। আশ্চর্য ব্যাপার, এই মানুষটিকে সে কিছু করতে পারছে না! এতক্ষণে ব্যথায় তাঁর ছটফট করা উচিত ছিল, কিন্তু লোকটি এখনো হাত তুলছে না। এর মানে কি এই যে, সে ব্যথা পাচ্ছে না? তা কী করে সম্ভব! তিন্নি ব্যথার পরিমাণ অনেক দূর বাড়িয়ে দিল। তার নিজের মাথাই এখন ঝিমঝিম করছে। মিসির আলি হাত তুললেন। তিনি পরীক্ষায় পাশ করেছেন। মিসির আলি দুর্বল গলায় বললেন, 'তিন্নি, আমি এখন যাই। তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে।'

তিন্নি জবাব দিল না। অবাক চোখে তাঁকে দেখতে লাগল।

মিসির আলি বললেন, 'তিন্নি, আমি কি তোমার আঁকা ছবিগুলি নিয়ে যেতে পারি?'

'কেন?'

'আমি নিজের ঘরে বসে সময় নিয়ে ছবিগুলি দেখব।'

'তাতে কী হবে?'

'তোমাকে বুঝতে সুবিধা হবে।'

তিন্নি তাঁর হাতে একগাদা ছবি তুলে দিল। মিসির আলি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। ক্লান্তিতে তাঁর পা ভেঙে আসছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। তিনি পেছনে ফিরলেন। তিন্নি ছাদে উঠে গেছে। তার মাথার উপর চক্রাকারে কয়েকটি পাখি উড়ছে।

আশেপাশে পাখি নেই। কিন্তু এই মেয়েটির মাথার উপর পাখি উড়ছে কেন? শালিক পাখি। কিচমিচ শব্দ করছে। মেয়েটিকে দেখে মনে হল, সেও কিছু বলছে পাখিদের। এত রহস্য কেন? মিসির আলি নিজের ঘরের দিকে এগুলেন। তাঁর মন ভারাক্রান্ত। তিনি নিজের ভিতর এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করলেন।

৪

সারাটা দিন তিন্নি ছাদে কাটাল।

এক বার এ-মাথায় যাচ্ছে, আরেক বার ও-মাথায়। মাঝে-মাঝে বিড়বিড় করে নিজের মনে কথা বলছে এবং হাসছে। শীতের দিনের রোদ দুপুরের দিকে খুব বেড়ে যায়। সারা গা চিড়বিড় করে। কিন্তু মেয়েটি নির্বিকার। হাঁটছে তো হাঁটছেই। রহিমা দুপুরে ছাদে এসে ভয়ে-ভয়ে বলেছিল, 'ভাত দিছি, খেতে আসেন।' তিন্নি কোনো কথা বলে নি। রহিমা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেছে। তিন্নি বুঝতে পারছে, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় রহিমা মনে মনে বলছে, 'পিশাচ, পিশাচ। মানুষ না, পিশাচ।' তিন্নির

খানিকটা রাগ লাগছিল। কিন্তু সে সামলে নিল। সব সময় রাগ করতে ভালো লাগে না। তার নিজেরও কষ্ট হয়। চোখ জ্বালা করে।

রহিমা চলে যাবার পরপরই বরকত সাহেব এলেন। তিনি কোনো কথা বললেন না। চিলেকোঠার কাছে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিন্নির মন-খারাপ হয়ে গেল। বাবা আগে তাকে ভয় পেতেন না। এখন পান। খুবই ভয় পান। অথচ সে বাবাকে এক দিনও ব্যথা দেয় নি। কোনো দিন দেবেও না।

'তিন্নি।'

'কি বাবা?'

'ভাত খেতে এস।'

'আমার খিদে নেই বাবা। যেদিন খুব রোদ ওঠে, সেদিন আমার খিদে হয় না।'

বরকত সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। সেই নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে তিন্নির আরো মন-খারাপ হয়ে গেল।

'তিন্নি।'

'কি বাবা?'

'যে-ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কি তোমার কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'তাঁকে তোমার কেমন লেগেছে?'

'ভালো।'

'তাহলে তাঁকে ব্যথা দিলে কেন? আমি কিছুক্ষণ আগে একতলায় গিয়েছিলাম, ভদ্রলোক মড়ার মতো পড়ে আছেন।'

তিন্নি জবাব দিল না। বরকত সাহেব বললেন, 'তুমি জান, তিনি কী জন্যে এসেছেন?'

'জানি। তিনি আমাকে বলেছেন।'

'তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো তোমার যত কথা আছে, সব ওঁকে বলবে। কিছুই লুকোবে না।'

'আচ্ছা।'

'তোমার স্বপ্নের কথাও বলবে।'

'তিনি বিশ্বাস করবেন না, হাসবেন।'

'না, হাসবেন না। উনি একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ। তোমার সব কথা উনি বুঝবেন। আমি যা বুঝতে পারি নি, উনি তা পারবেন।'

তিন্নি বলল, 'উনি কি গাছের মতো জ্ঞানী?'

বরকত সাহেব মৃদুস্বরে বললেন, 'তোমার গাছের ব্যাপারটা আমি জানি না তিন্নি। কাজেই বলতে পারছি না গাছের মতো জ্ঞানী কি না। আমার ধারণা, গাছের জীবন থাকলেও তা খুব নিম্ন পর্যায়ের। জ্ঞান-বুদ্ধির ব্যাপার সেখানে নেই।'

'বাবা।'

'বল মা।'

'আমার স্বপ্নের ব্যাপারটা কি আজই ওঁকে বলব?'

'না, আজ না-বললেও হবে। কাল বল। আজ ভদ্রলোক ঘুমুচ্ছেন। আমার মনে হয়

সারা দিনই ঘুমুবেন। তুমি ব্যথা দেবার পর উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

তিন্নি লজ্জিত হল। কিছু বলল না। বরকত সাহেব বললেন, 'তুমি কি ছাদেই থাকবে?'

'হ্যাঁ। তুমি যাও, ভাত খাও।'

বরকত সাহেব নেমে গেলেন। তিন্নি ছাদের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত আবার হাঁটতে শুরু করল। সে নেমে এল সন্ধ্যাবেলায়। তার গা ঝিমঝিম করছে। হাত-পা কাঁপছে। আজ সে আবার স্বপ্ন দেখবে। এসব লক্ষণ তার এখন চেনা হয়ে গেছে। তার ভয়ভয় করতে লাগল। স্বপ্ন এত বাজে ব্যাপার, এত কষ্টের!

ঘুমুবার আগে তিন্নি একবাটি দুধ খেল। রহিমা কমলা এনেছিল খোসা ছাড়িয়ে। তার দু'টি কোয়া মুখে দিল। রহিমা বলল, 'আমি এই ঘরে ঘুমাইব আপা?' তিন্নি কড়া গলায় বলল,—'না।' রহিমা প্রতি রাতেই এই কথা বলে। প্রতি রাতেই তিন্নি একই উত্তর দেয়। একা-থাকা তার অভ্যেস হয়ে গেছে। অথচ কেউ সেটা বুঝতে চায় না। বাবাও মাঝে মাঝে এসে বলেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে ঘুমুবে মা?'

একবার খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। ঘন-ঘন বাজ চমকাচ্ছিল। বাবা এসে জোর করে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে কত বার বলেছে, 'আমি কাউকেই ভয় করি না।' বাবা শোনেন নি। বাবা-মারা কোনো কথা শুনতে চায় না। মার কথা সে অবশ্যি বলতে পারে না, কারণ মার কথা তার কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে মাথাভর্তি চুলের একটি গোলগাল মুখ তার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। তিন্নি ভাবতে লাগল, মা বেঁচে থাকলে এখন কী করত? তাকে নিয়ে খুব সমস্যায় পড়ে যেত। হয়তো রোজ রাতে তার সঙ্গে ঘুমুত। কান্নাকাটি করত। আচ্ছা, সে এ রকম হল কেন? সে অন্য সব মেয়েদের মতো হল না কেন?

রহিমা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। সরাসরি তিন্নির দিকে তাকাচ্ছে না। কিন্তু মনে-মনে চাচ্ছে তাড়াতাড়ি এ-ঘর থেকে চলে যেতে। তিন্নি ভেবে পেল না, যে চলে যেতে চাচ্ছে, সে চলে না-গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

'রহিমা।'

'জ্বি আপা?'

'তুমি আজ সকালে আমাকে পিশাচ ডাকছিলে কেন?'

রহিমার মুখ সাদা হয়ে গেল। দেখতে-দেখতে কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমল।

'পিশাচরা কী করে রহিমা?'

রহিমা তার জবাব দিল না। তার পানির পিপাসা পেয়ে গেছে। বুক শুকিয়ে কাঠ।

'আর কোনো দিন আমাকে পিশাচ ডাকবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'এখন যাও।'

আজ বোধহয় স্বপ্নটা সে দেখবেই। বিছানায় শোয়ামাত্র চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে। অনেক চেষ্টা করেও চোখ মেলে রাখা যাচ্ছে না। ঘরের বাতাস হঠাৎ যেন অনেকখানি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঝুনঝুন শব্দ হচ্ছে দূরে। এই দূর অনেকখানি দূর। গ্রহ-নক্ষত্র ছাড়িয়ে দূরে, আরো দূরে। তিন্নি ছটফট করতে লাগল। সে ঘুমুতে চায় না, জেগে থাকতে চায়। কিন্তু ওরা তাকে জেগে থাকতে দেবে না। ঘুম পাড়িয়ে দেবে। এবং ঘুম পাড়িয়ে অদ্ভুত

সব স্বপ্ন দেখাবে।

তিন্নি সেই রাতে যে-স্বপ্ন দেখল তা অনেকটা এ রকম ঃ একটি বিশাল মাঠে সে দাঁড়িয়ে আছে। যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু গাছ আর গাছ। বিশাল মহীরুহ। এইসব গাছের মাথা যেন আকাশ স্পর্শ করেছে। গাছগুলি অদ্ভুত। লতানো ডাল। কিছু-কিছু ডাল আবার বেণী পাকানো। তাদের গায়ের রঙ সবুজ নয়, হলুদের সঙ্গে লাল মেশানো। হালকা লাল। এইসব গাছ একসঙ্গে হঠাৎ কথা বলে উঠছে। নিজেদের মধ্যে কথা। আবার কথা বন্ধ করে দিচ্ছে। তখন চারদিকে সুনসান নীরবতা। শোনা যাচ্ছে শুধু বাতাসের শব্দ। ঝড়ের মতো শব্দে বাতাস বইছে। আবার সেই শব্দ থেমে যাচ্ছে। তখন কথা বলছে গাছেরা। কত অদ্ভুত বিষয় নিয়ে কত অদ্ভুত কথা। তার প্রায় কিছুই তিন্নি বুঝতে পারছে না। একসময় সমস্ত কথাবার্তা থেমে গেল। তিন্নি বুঝতে পারল সব ক'টি গাছ লক্ষ করছে তাকে। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'কেমন আছ ছোট্ট মেয়ে?'

'ভালো।'

'ভয় পাচ্ছ কেন তুমি?'

'আমি ভয় পাচ্ছি না।'

'অল্প-অল্প পাচ্ছ। কোনো ভয় নেই।'

'কোনো ভয় নেই'--বলার সঙ্গে-সঙ্গে সব ক'টি গাছ একত্রে বলতে লাগল, 'ভয় নেই। কোনো ভয় নেই।'

ভয়াবহ শব্দ! কানে তালা লেগে যাবার মতো অবস্থা! তিন্নি তখন কেঁদে ফেলল, তার কান্নার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত শব্দ থেমে গেল। কথা বলল শুধু একটি গাছ।

'ছোট্ট মেয়ে তিন্নি।'

'কি?'

'কাঁদছ কেন?'

'জানি না কেন। আমার কান্না পাচ্ছে।'

'ভয় লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো ভয় নেই। তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।'

কথা শেষ হবার সঙ্গে আলো কমে এল। সব ক'টি গাছ একত্রে মাথা দুলিয়ে কী-সব গান করতে লাগল। এই গানে মনে অদ্ভুত এক আনন্দ হয়। শুধু মনে হয় কত সুখ চারদিকে। শুধু বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। আনন্দ করতে ইচ্ছা করে।

'ঘুম আসছে ছোট্ট মেয়ে তিন্নি?'

'আসছে।'

'তাহলে ঘুমাও। আমাদের গান তোমার ভালো লাগছে?'

'লাগছে।'

'খুব ভালো?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো।'

গাঢ় ঘুমে তিন্নির চোখ জড়িয়ে এল। স্বপ্ন শেষ হয়েছে। কিন্তু শেষ হয়েও যেন হয় নি। তার রেশ লেগে আছে তিন্নির চোখে-মুখে।

৫

মিসির আলি সারাদিন ঘুমুলেন।

দুপুরে এক বার ঘুম ভেঙেছিল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। তিনি পরপর দু'গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেয়ে আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন। যখন জাগলেন, তখন বেশ রাত। বিছানার পাশে উদ্বিগ্ন মুখে বরকত সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। এক জন বেঁটেমতো লোক আছে, হাতে স্টেথিসকোপ। নিশ্চয়ই ডাক্তার। দরজার পাশে চোখ বড়-বড় করে দাঁড়িয়ে আছে নিজাম। বোঝাই যাচ্ছে সে বেশ ভয় পেয়েছে।

বরকত সাহেব বললেন, 'এখন কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

মিসির আলি উঠতে চেষ্টা করলেন। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'নড়াচড়া করবেন না। চুপ করে শুয়ে থাকুন। আপনার ব্লাড প্রেশার অ্যাবনরম্যালি হাই।'

তিনি কিছু বললেন না। নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে তাঁর সময় লাগছে। ঘুমঘুম ভাবটা ঠিক কাটছে না। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'হাই প্রেশারে কত দিন ধরে ভুগছেন?'

'প্রেশার ছিল না। হঠাৎ করে হয়েছে। যে-জিনিস হঠাৎ আসে তা হঠাৎই যায়। কি বলেন?'

'না না, খুব সাবধান থাকবেন। আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। বরকত সাহেবকে বলছিলাম হাসপাতালে ট্রান্সফার করবার জন্যে। সত্যি করে বলুন, এখন কি বেটার লাগছে?'

'লাগছে। আগের মতো খারাপ লাগছে না।'

ডাক্তার গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'হঠাৎ করে এ রকম হাই প্রেশার হবার তো কথা নয়। খুব আনইউজুয়েল।'

তিনি একগাদা অষুধপত্র দিলেন। যাবার সময় বারবার বললেন, 'রেস্ট দরকার। কমপ্লিট রেস্ট। কিছু খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়ুন। একটা ঘুমের অষুধ দিয়েছি। খেয়ে টানা ঘুম দিন। ভোরে এসে আমি আবার প্রেশার মাপব।'

বরকত সাহেব বললেন, 'আপনি তো সারা দিন কিছু খান নি।'

'এখন খাব। গোসল সেরে খেতে বসব। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। আপনি কি দয়া করে খাবারটা আমার ঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন?'

'নিশ্চয়ই করব। আপনার সঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

মিসির আলি বললেন, 'আজ না, আমি আগামীকাল কথা বলব।'

'ঠিক আছে, আগামীকাল।'

বরকত সাহেব ঘর থেকে বেরুতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন। নিচু গলায় বললেন, 'আপনার কষ্ট হল খুব। আমি লজ্জিত।'

'আপনার লজ্জিত হবার কিছুই নেই। আপনি এ নিয়ে ভাববেন না।'

দীর্ঘ স্নানের পর মিসির সাহেবের বেশ ভালোই লাগল। ক্লান্তির ভাব নেই। মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণা আছে, তবে তা সহনীয়। এবং মনে হচ্ছে গরম এক কাপ চা খেলে সেরে যাবে।

খাবার নিয়ে এল নিজাম। মিসির আলি লক্ষ করলেন, নিজাম তাঁকে বারবার আড়চোখে দেখছে। তার চোখে সীমাহীন কৌতূহল। সম্ভবত সে কিছু বলতে চায়, সাহস পাচ্ছে না। মিসির আলি ভারি গলায় ডাকলেন, 'নিজাম।'

'জ্বি স্যার?'

'তুমি কেমন আছ?'

'জ্বি স্যার, ভালো।'

'তিন্নি তোমাকে কখনো মাথাব্যথা দেয় নি?'

নিজাম চমকে উঠল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। সহজভাবে ভাত-তরকারি এগিয়ে দিতে লাগল।

'কথা বলছ না কেন নিজাম?'

'কী বলব স্যার?'

'ঐ যে জিজ্ঞেস করলাম, তিন্নি তোমাকে মাথাব্যথা দেয় কি না। আমার ধারণা, সবাইকেই মাঝে-মাঝে দেয়। ঠিক বলছি না?'

'জ্বি স্যার, ঠিক বলছেন।'

'তোমাকেও দিয়েছে?'

'জ্বি স্যার।'

'ক' বার দিয়েছে?'

'অনেক বার।'

'তবু তুমি এ-বাড়িতে পড়ে আছ কেন? চলে যাচ্ছ না কেন?'

নিজাম জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, 'আমি ওর অসুখ ভালো করবার জন্যে এসেছি। কাজেই ওর সম্পর্কে সব কিছু আমার জানা দরকার। তোমরা যদি না বল, তাহলে আমি জানব কী করে?'

'কী জানতে চান স্যার?'

'মানুষকে কষ্ট দেবার এই ব্যাপারটা ও কবে থেকে শুরু করেছে?'

'তিন বছর ধরে হচ্ছে।'

'প্রথম কীভাবে এটা শুরু হল তোমার মনে আছে?'

'জ্বি, আছে। রহিমা তিন্নি আপার জন্যে দুধ নিয়ে গিয়েছিল। তিন্নি আপা খাচ্ছিল না। তখন রাগের মাথায় রহিমা তিন্নি আপাকে একটা চড় দেয়। তার পরই শুরু হয়। রহিমা চিৎকার করতে থাকে, গড়াগড়ি করতে থাকে। ভয়ংকর কষ্ট পায়।'

'রহিমা কি এখনো কাজ করে এ-বাড়িতে?'

'জ্বি।'

'এ-রকম কষ্ট কি সে আরো পেয়েছে?'

'জ্বি স্যার।'

'তবু সে এ বাড়িতে পড়ে আছে? চলে যায় না কেন?'

নিজাম জবাব দিল না। মিসির আলি লক্ষ করলেন, এই প্রশ্নটির জবাব নিজাম এড়িয়ে যাচ্ছে। এত কষ্টের পরও কাজের মানুষগুলি এখানেই আছে। তার কী কারণ হতে পারে? হয়তো অনেক বেশি বেতন দেয়া হচ্ছে, যে-কারণে থাকছে। কিন্তু এটা বলতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

'তুমি বেতন কত পাও নিজাম?'

'জ্বি, মাসে দেড়শ' টাকা আর কাপড়চোপড়।'

মিসির আলির মনে হল, এটা এমন কোনো বেশি বেতন নয়। কাজেই এরা যে এখানে পড়ে আছে, নিশ্চয়ই তার কারণ অন্য।

'নিজাম।'

'জ্বি স্যার?'

'তুমি কি আমাকে চা খাওয়াতে পার?'

'নিয়ে আসছি স্যার।'

'আর শোন, রহিমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। ওকে পেলে বলবে আমার কথা।'

'জ্বি আচ্ছা।'

নিজাম চট করে চা নিয়ে এল। লোকটি করিৎকর্মা। চা-টা হয়েছেও চমৎকার। চুমুক দিতে-দিতেই মাথার যন্ত্রণা প্রায় সেরে গেল।

'চিনি লাগবে স্যার?'

'না, লাগবে না। খুব ভালো চা হয়েছে নিজাম। বস তুমি। টুলটায় বস, কথা বলি।

নিজাম বসল না। জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মিসির আলি বললেন, 'তিন্নির মধ্যে আর কি অস্বাভাবিক ব্যাপার তুমি লক্ষ করেছ?'

নিজাম মাথা চুলকাতে লাগল। মিসির সাহেব বললেন, 'ভালো করে চিন্তা করে বল। সে এমন কিছু কি করে, যা আমরা সাধারণত করি না?'

'তিন্নি আপা রোদের মধ্যে বসে থাকতে ভালবাসেন।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি স্যার। জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদেও তিন্নি আপা সারা দিন ছাদে বসে থাকেন।'

'এ ছাড়া আর কী করে?'

'আর কিছু না।'

'মনে করতে চেষ্টা কর। হয়তো কোনো ছোট ব্যাপার। তোমার কাছে হয়তো এর কোনো মূল্যই নেই, কিন্তু আমার কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বুঝতে পারছ আমার কথা?'

'জ্বি স্যার।'

রাত একটার দিকে মিসির আলি তিন্নির আঁকা ছবিগুলি নিয়ে বসলেন। সব মিলিয়ে পাঁচটি ছবি। প্রতিটি ছবিই গাছ বা গাছজাতীয় কিছুর। বেশির ভাগ গাছ লতানো। গাছের রঙ হলুদ থেকে লালের মধ্যে। সবুজের কিছুমাত্র ছোঁয়া নেই। তিন্নি হলুদ এবং লাল রঙ দিয়ে ছবি আঁকল কেন? সম্ভবত তার কাছে সবুজ রঙ ছিল না। অবশ্যি শিশুরা অদ্ভুত রঙ ব্যবহার করতে ভালবাসে। তাঁর এক ভাগনী মানুষ আঁকে আকাশি নীল রঙে। মানুষের চোখে দেয় গাঢ় লাল রঙ।

অবশ্যি এই পাঁচটি ছবি শিশুর আঁকা ছবি বলে মনে হচ্ছে না। শিশুরা এত চমৎকার আঁকে না। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে ঝড় হচ্ছে। প্রচণ্ড ঝড়। কোনো শিশু, তা সে যত প্রতিভাবান শিশুই হোক, এ-রকম নিখুঁত ঝড়ের ছবি আঁকতে পারবে না।

ছবি দেখে মনে হয়, ঝড়ের সময়টায় এই ছবির শিল্পী উপস্থিত ছিল। হাওয়ার যে ঘূর্ণি উঠেছে, তাও সে লক্ষ করেছে। মিসির আলি সাহেব মনে মনে একটি থিওরি দাঁড় করাতে চেষ্টা করলেন। তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন, ছবিগুলি কোনো শিশুর মনগড়া ছবি নয়, কল্পনার ছবি নয়। এই গাছ, এই ঝড়, বাতাসের এই ঘূর্ণি ছবির শিল্পী দেখেছে।

যদি তাই হয়, তাহলে এ গাছগুলি কি পৃথিবীর? পৃথিবীর গাছে সবুজ রঙ থাকবে। ছায়াতে জন্মানো কিছু কিছু হলুদ গাছ তিনি দেখেছেন, কিন্তু এ রকম কড়া সূর্যের আলোয় হলুদ গাছ তিনি দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না।

প্রতিটি ছবিতে দু'টি সূর্য। গন্‌গনে সূর্য। এর মানে কী? পৃথিবীর কোনো ছবিতে দু'টি সূর্য থাকবে না। তাহলে কি এই থিওরি দাঁড় করানো যায় যে, ছবিতে যে–দৃশ্য দেখা যাচ্ছে তা অন্য কোনো গ্রহের? তা কেমন করে হয়?

তিন্নি অন্য কোনো গ্রহের মেয়ে, এই যুক্তি হাস্যকর। তিন্নি পৃথিবীরই মেয়ে, এতে কোনো সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। এই গ্রহের মেয়ে হয়ে বাইরের একটি গ্রহের ছবি সে কেন আঁকছে? কীভাবে আঁকছে?

মিসির আলি গম্ভীর মুখে দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরালেন। সব কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ছকে ফেলা যাচ্ছে না।

তিনি সিগারেট টানতে টানতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন এবং ভাবতে চেষ্টা করলেন--এইসব অল্পবয়সী একটি মেয়ের কল্পনার ছবি, এর বেশি কিছু নয়। মেয়েটির কল্পনাশক্তি খুব উচ্চ পর্যায়ের, যার জন্যে সে এত চমৎকার কিছু ছবি আঁকতে পারছে। ভোরবেলায় তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

মিসির আলির ঠাণ্ডা লাগছে। হু–হু করে বইছে উত্তুরে হাওয়া। কিন্তু এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ লাগছে। চারদিক খুব চুপচাপ। আকাশে চাঁদ থাকায় চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না ভেঙে–ভেঙে পড়ছে। কী অপূর্ব একটি দৃশ্য! মিসির আলি নিজের অজান্তেই হাঁটতে–হাঁটতে একটা ঝাঁকড়া জামগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঠিক তখন অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল। তিনি স্পষ্ট শুনলেন, তিন্নি বলছে, 'কি, আপনার ঘুম আসছে না?' তিনি আশেপাশে কাউকেই দেখলেন না। দেখার কথাও নয়। এই নিশিরাত্রিতে তিন্নি নিশ্চয়ই নিচে নেমে আসে নি। তিনি বললেন, 'কে কথা বলল?'

মিসির আলি খিলখিল হাসির শব্দ শুনলেন। এর মানে কী? তিন্নির হাসি কোত্থেকে ভেসে আসছে? মিসির আলি বললেন, 'তুমি তিন্নি?'

'হ্যাঁ।'

'কোত্থেকে কথা বলছ?'

'আপনি এত বুদ্ধিমান, অথচ কোত্থেকে কথা বলছি, বুঝতে পারছেন না?'

'না, বুঝতে পারছি না। তুমি কোথায়?'

'আমি আমার ঘরেই আছি। কোথায় আবার থাকব?'

মিসির আলি একটা বড় ধরনের চমক পেলেন। মেয়েটি তার ঘর থেকেই কথা বলছে। সেইসব কথা তিনি পরিষ্কার শুনছেন। টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ। অদ্ভুত তো।

মেয়েটিও নিশ্চয়ই তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছে। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার জন্যে

নিশ্চয়ই চেঁচাতে হবে না। মনে-মনে ভাবলেই তিন্নি বুঝবে। মিসির আলি কথা বলা শুরু করলেন। এ-রকম অদ্ভুত কথোপকথন তিনি আগে কখনো করেন নি।

মিসির আলি : কেমন আছ তিন্নি?

তিন্নি : ভালো।

মিসির আলি : এখনো জেগে আছ?

তিন্নি : হ্যাঁ, আছি।

মিসির আলি : কেন?

তিন্নি : আমারও আপনার মতো ঘুম আসছে না।

মিসির আলি : রোজই জেগে থাক?

তিন্নি : মাঝে-মাঝে থাকি।

মিসির আলি : তোমার ছবিগুলি বসে-বসে দেখলাম।

তিন্নি : আমি জানি।

মিসির আলি : খুব সুন্দর হয়েছে।

তিন্নি : তাও জানি।

মিসির আলি : এগুলি কোথাকার ছবি?

তিন্নি : বলব না।

মিসির আলি : কেন, বলতে অসুবিধা কি?

তিন্নি : বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

মিসির আলি : ছবিতে দেখলাম দু'টি সূর্য।

তিন্নি : হ্যাঁ, দু'টি।

মিসির আলি : দু'টি কেন?

তিন্নি : দু'টি থাকলে আমি কী করব? একটি আঁকব?

কথাবার্তা এই পর্যন্তই। মিসির আলি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু আর কোনো যোগাযোগ হল না। তিনি বেশ কয়েক বার ডাকলেন, 'তিন্নি তিন্নি।' কোনো জবাব নেই।

মিসির আলি নিজের বিছানায় ফিরে এলেন। ঘুম চটে গিয়েছে। শুয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। তিনি আবার ছবি নিয়ে বসলেন। যদি নতুন কিছু বের হয়ে আসে। যে-মাটির উপর গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে, তার রঙ কী? আকাশের রঙ কী? গাছপালার ফাঁকে কোনো কীটপতঙ্গ আছে কি? যদি থাকে, তাদের রঙ কী?

'আপনি এখনো জেগে আছেন?'

তিনি চমকে উঠলেন। তিন্নি আবার কথা বলা শুরু করেছে।

'হ্যাঁ, এখনো জেগে আছি। তোমার ছবি দেখছি।'

'কেন দেখছেন? এক বার দেখাও যা এক শ' বার দেখাও তা।'

'উঁহু, তুমি ঠিক বললে না। প্রথম বার অনেক কিছু চোখে পড়ে না।'

'আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'ঘুম আসছে না।'

'আমি কিন্তু আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি।'

'পার নাকি?'

'হ্যাঁ, পারি। দেব?'

'না, তার দরকার নেই। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে।'

'তাহলে কথা বলুন।'

'আমার সঙ্গে তুমি যেভাবে কথা বলছ, অন্যদের সঙ্গেও কি সেইভাবে কথা বল।

'না।'

'কেন বল না।'

'বলতে ইচ্ছা করে না।'

মিসির আলি চেষ্টা করতে লাগলেন আজেবাজে প্রশ্নের ফাঁকে-ফাঁকে দু'-একটি জরুরি প্রশ্ন করে খবরাখবর বের করে আনতে। কিন্তু মেয়েটি খুব সাবধানী। সে অনায়াসে ফাঁদ কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। তবু এর মধ্যে একটি হচ্ছে—তিন্নি শুধু মানুষ নয়, পশুদের সঙ্গেও (যেমন বেড়াল) যোগাযোগ করতে পারে। মিসির আলি জিজ্ঞেস করলেন, 'বেড়াল তোমার কথা বুঝতে পারে?'

'হুঁ, পারে।'

'তুমি ওর কথা বুঝতে পার?'

'বেড়াল কোনো কথা বলে না। তবে সে যা ভাবে তা বুঝতে পারি। অবশ্যি সব সময় পারি না।'

'কখন-কখন পার?'

'তা জেনে আপনি কী করবেন? আপনি কি বেড়াল?'

তিন্নি খিলখিল করে হাসতে লাগল। মিসির আলি রোমাঞ্চ বোধ করলেন। মেয়েটি নিজের ঘরে বসে হাসছে, অথচ তিনি কী স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন।

'তিন্নি।'

'বলুন।'

'এই যে তুমি কথা বলছ, আমি শুনছি। আচ্ছা, এ-বাড়িতে অন্য যারা আছে, তারা কি শুনছে?'

'তারা শুনবে কীভাবে, আমি কি তাদের সঙ্গে কথা বলছি?'

'তাও তো ঠিক। আচ্ছা ধর, কাল ভোরে আমি যদি অনেক দূর চলে যাই—তিন-চার মাইল দূরে কিংবা তার চেয়েও দূরে, তখনো কি তুমি আমার কথা শুনতে পারবে?'

তিন্নি বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমি আর কথা বলব না।'

মিসির আলি বললেন, 'শুভরাত্রি তিন্নি।' তার কোনো জবাব তিনি শুনতে পেলেন না। মাথার যন্ত্রণাটা আবার ফিরে এসেছে। শরীরটা হালকা লাগছে। মিসির আলি ডাক্তারের দিয়ে-যাওয়া ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমুতে গেলেন। ভালো ঘুম হল না। আজেবাজে স্বপ্ন দেখলেন, বেশ কয়েক বার ঘুম ভেঙেও গেল।

৬

শীতের ভোরবেলায় ময়মনসিংহ শহর মিসির আলির বেশ লাগল। তিনি অন্ধকার

থাকতেই জেগে উঠেছেন। একটা উলের চাদর গায়ে দিয়ে শহর দেখতে বের হয়েছেন। আজ আর দারোয়ান তাঁকে বাধা দেয় নি, গেট খুলে দিয়েছে। এবং হাসিমুখে বলেছে, 'এত সকালে কই যান?' সম্ভবত বরকত সাহেব দারোয়ানকে কিছু বলেছেন।

সব মফস্বল শহর দেখতে এক রকম, তবু এই শহরটি ব্রহ্মপুত্র নদীর জন্যেই বোধহয় একটু আলাদা। কিংবা কে জানে ভোরবেলার আলোর জন্যেই হয়তো এ-রকম লাগছে। মিসির আলি হেঁটে হেঁটে নদীর পাড়ে চলে গেলেন। নদী শুকিয়ে এতটুকু হয়েছে। চিনির দানার মতো সাদা বালির চর পড়েছে। অদ্ভুত লাগছে দেখতে। মর্নিংওয়াকে বের হয়েছে, এ রকম বেশ কয়েকটি দল পাওয়া গেল। সবই বুড়োর দল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে হঠাৎ শরীরের জন্যে তাদের মমতা জেগে উঠেছে। এইসব অপূর্ব দৃশ্য আরো কিছুদিন দেখতে হলে শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

মিসির আলি নদীর পাড় ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে , তাঁর মনে কোনো উদ্দেশ্য আছে। তিনি কিছু-একটা করতে চান। কিন্তু তাঁর মনে কোনো গোপন উদ্দেশ্য ছিল না। ভোরবেলায় নদীর পাড়ের একটি ছোট শহর দেখতে ভালো লাগছে, এই যা। মাইল দু'-এক হাঁটার পর খানিকটা ক্লান্তি বোধ করলেন। বয়স হয়ে যাচ্ছে। এখন আর আগের মতো পরিশ্রম করতে পারেন না।

ঘড়িতে ছ'টা বাজছে। এখন উল্টো পথে হাঁটা শুরু করা দরকার। বরকত সাহেব নিশ্চয়ই ভোরের নাশতা নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

একটা খেয়াঘাট দেখা যাচ্ছে। খেয়াঘাটের পাশে বেঞ্চি পেতে সুন্দর একটা চায়ের দোকান। মিসির আলি বেঞ্চিতে বসে চায়ের কথা বললেন। সিগারেট খাবার ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু প্যাকেট ফেলে এসেছেন। চা শেষ করবার পর লক্ষ করলেন, শুধু সিগারেট নয়, মানিব্যাগও ফেলে এসেছেন। তাঁর অস্বস্তির সীমা রইল না। তিনি প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'আগামীকাল ভোরবেলা চায়ের পয়সা দিয়ে যাব। আমি ভুলে মানিব্যাগ ফেলে এসেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

চায়ের দোকানি দাঁত বের করে হাসল। যেন খুব মজার একটা কথা শুনছে।

'কোনো অসুবিধা নাই। দরকার হইলে আরেক কাপ খান।'

মিসির আলি সত্যি-সত্যি আরেক কাপ চা খেলেন। অল্প অল্প রোদ উঠেছে। রোদে পা মেলে জ্বলন্ত উনুনের সামনে একটা হাত মেলে দিয়ে চা খেতে বেশ লাগছে। মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, 'দোকান আপনার কেমন চলে? লোকজন তো দেখি না।'

'দোকান চলে না। বিকিকিনি নাই। মানুষজন নাই, চা কে খাইব কন?'

'ভালো জায়গায় গিয়ে দোকান করেন, যেখানে লোকজন আছে।'

দাড়িওয়ালা লোকটি হাসিমুখে বলল, 'মনের টানে পইড়া আছি। জায়গাটা বড় ভালো লাগে। মায়া পইড়া গেছে। একবার মায়া পড়লে যাওন মুসিবত।'

মিসির আলি চমকে উঠলেন। এই বুড়োর কথায় একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বুঝতে পারছেন, কেন এত কষ্টের পরও নিজাম বা রহিমা ও-বাড়িতে পড়ে আছে। সেখানেও মায়া ব্যাপারটাই কাজ করছে। এই মায়া তৈরির ব্যাপারে তিন্নিরও নিশ্চয়ই একটি ভূমিকা আছে। মায়া জাগিয়ে রাখছে তিন্নি। কেউ তা বুঝতে পারছে না।

মানুষের সমস্ত আবেগ এবং অনুভূতির কেন্দ্রবিন্দু মস্তিষ্ক। মেয়েটি সেই মস্তিষ্ক

নিয়ন্ত্রণ করতে পারে অতি সহজেই। মিসির আলির মনে হল, এই মেয়েটি একই সঙ্গে দু'টি কাজ করে—আশেপাশের লোকজনদের একটু দূরে সরিয়ে রাখে, আবার টেনে রাখে নিজের দিকে।

মেয়েটি নিজের সব ক্ষমতাও সবাইকে দেখাচ্ছে না। যেমন ধরা যাক, দূর থেকে কথোপকথনের ক্ষমতা। এর খবর এ-বাড়ির অন্য কেউ জানে না। কিন্তু কেন জানে না? কেন এই মেয়েটি এইসব তথ্য গোপন রেখেছে?

আবার পুরোপুরি গোপনও রাখছে না। তাঁর কাছে প্রকাশ করেছে। কেন করেছে? আশঙ্কা কেন? এর উত্তর বের করতে হবে। একটির পর একটি তথ্যকে সাজাতে হবে। একটি ছকের মধ্যে ফেলতে হবে। মিসির আলি চিন্তিত বোধ করলেন। নিজের অজান্তেই আরেক কাপ চা চাইলেন।

চায়ের দোকানি খুশি মনেই চা ছাঁকতে বসল।

'আমি কাল সকালেই দাম দিয়ে যাব।'

'কোনো অসুবিধা নাই। তিন কাপ চায়ের লাগিন ফতুর হইতাম না। আমরা ময়মনসিং-এর লোক। আমরার কইলজা বড়।'

'নাম কি আপনার?'

'রশিদ।'

'আচ্ছা ভাই রশিদ, আপনার কছে সিগারেট আছে?'

'সিগারেট নাই, বিড়ি আছে। খাইবেন?'

'দেন দেখি একটা।'

মিসির আলি চিন্তিত মুখে বিড়ি টানতে লাগলেন। বেলা বাড়ছে, তাঁর খেয়াল নেই। অনেক কাজ পড়ে আছে সামনে। কাজ গোছাতে হবে। কীভাবে গোছাতে হবে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন না।

এ-বাড়ির প্রতিটি মানুষকে জেরা করতে হবে। এলোমেলো প্রশ্ন-উত্তর নয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ জেরা। তিন্নির মার সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে, ভদ্রমহিলার চিঠিপত্র, ডায়েরি—এইসব দেখতে হবে। ভালোভাবে জানতে হবে, তিনি মেয়ে সম্পর্কে কী ভাবতেন। মায়েরা অনেক কিছু বুঝতে পারে।

'কি ভাবেন?'

মিসির আলি চমকে উঠে বললেন, 'কিছু ভাবি না ভাই। চায়ের জন্যে ধন্যবাদ। কাল সকালে আমি আবার আসব।'

'জ্বি আইচ্ছা। আপনে ময়মনসিংয়ের লোক না মনে হইতাছে।'

'জ্বি-না। আমি ঢাকা থেকে এসেছি।'

'কুটুম্ব বাড়ি?'

'জ্বি, কুটুম্ব বাড়ি।'

৭

'তোমার নাম রহিমা?'

'জ্বি।'

'ভালো আছ রহিমা?'

'জ্বি, আল্লাহ্‌তালা যেমুন রাখছে।'

রহিমা লম্বা একটা ঘোমটা টানল। এই লোকটি তার কাছে কী জানতে চায়, তা সে বুঝতে পারছে না। সে তো কিছুই জানে না, তাকে কিসের এত জিজ্ঞাসাবাদ! তিন্নির আব্বা বলে দিয়েছেন--উনি যা জানতে চান, সব বলবে। কিছুই গোপন করবে না। এও এক সমস্যা। গোপন করার কী আছে?

'রহিমা।'

'জ্বি?'

'দেশের বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?'

'এক মাইয়া আছে।'

'মেয়েকে দেখতে যাও না?'

'জ্বি, যাই।'

'শেষ বার কবে গিয়েছিলে?'

'তিন বছর আগে।'

'এই তিন বছর যাও নি কেন?'

রহিমা চমকে উঠল। তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে। যেন সে নিজেই গভীর চিন্তায় পড়ে গেছে, কেন যায় নি।

'মেয়ে যাবার জন্যে বলে না?'

'জ্বি, বলে।'

'তবু যেতে ইচ্ছে করে না, তাই না?'

রহিমা চুপ করে রইল। মিসির আলি বললেন, 'তিন্নির মাকে তো তুমি দেখেছ, তাই না?'

'জ্বি।'

'কেমন মহিলা ছিলেন?'

'খুব ভালো। এমুন মানুষ দেখি নাই। খুব সুন্দর আছিল। কী রকম ব্যবহার! কাউরে রাগ হয়ে কথা কয় নাই।'

'ঐ ভদ্রমহিলার মধ্যে তিন্নির মতো কোনো কিছু ছিল কি?'

'জ্বি-না। বড় ভালোমানুষ ছিল। ইনার কথা মনে হইলেই চউক্ষে পানি আসে।'

রহিমা সত্যি-সত্যি চোখ মুছল। মিসির আলির আর কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল না।

অন্যদের কাছ থেকে তেমন কিছু জানা গেল না। বাড়ির দারোয়ানের একটি কথা অবশ্যি বেশ গুরুত্বপূর্ণ, সে বলছে, তিন্নি ছোটবেলায় খুব ছোটাছুটি করত। বাগানে দৌড়াত। যতই সে বড় হচ্ছে, ততই তার ছোটাছুটি কমে যাচ্ছে। এখন বেশির ভাগ সময় সে ছাদে হাঁটাহাঁটি করে কিংবা চুপচাপ বসে থাকে।

'তুমি ক'দিন ধরে এ বাড়িতে আছ?'

'জ্বি, অনেক দিন।'

'ছুটিছাটায় দেশের বাড়িতে যাও না?'

'জ্বি, যাই।'

'শেষ কবে গিয়েছিলে?'

অনেক হিসাব-নিকাশ করে দারোয়ান বলল, 'তিন বছর আগে একবার গিয়েছিলাম।'

'গত তিন বছরে যাও নি?'

'জ্বি না।'

তিন্নির মার পুরোনো চিঠিপত্র বা ডায়েরি, কিছুই পাওয়া গেল না। বরকত সাহেব বললেন, 'এ-দেশের মেয়েদের কি আর ডায়েরি লেখার অভ্যাস আছে? এরা ঘরের কাজকর্ম শেষ করেই সময় পায় না। ডায়েরি কখন লিখবে?'

'চিঠিপত্র? পুরোনো চিঠিপত্র?'

'পুরোনো চিঠিপত্র কি কেউ জমা করে রাখে, বলুন? চিঠি আসে, চিঠি পড়ে ফেলে দিই। ব্যস। তা ছাড়া ও চিঠি লিখবে কাকে? বাপ-মা-মরা মেয়ে ছিল। মামার কাছে মানুষ হয়েছে। বিয়ের পর সেই মামা মারা গেলেন। সে একা হয়ে গেল। চিঠিপত্র লেখার বা যোগাযোগের কেউ ছিল না।'

'আপনার স্ত্রী কি খুব বিষণ্ন প্রকৃতির ছিলেন?'

'না মনে হয়। হাসিখুশিই তো ছিল।'

'কোনোরকম অসুখ-বিসুখ ছিল কি?'

'বলার মতো তেমন কিছু না, সর্দিকাশি—এইসবে খুব ভুগত। এটা নিশ্চয়ই তেমন কিছু না।'

'তিন্নি যখন তাঁর পেটে, সে-সময় কি তাঁর জার্মান মিজেলস হয়েছিল?

'এটা কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'জার্মান মিজেলস একটা ভাইরাসঘটিত অসুখ। এতে বাচ্চার অনেক ধরনের ক্ষতি হবার কথা বলা হয়। ''জীনে'' কিছু ওলটপালট হয়।'

'না, এ-ধরনের কোনো অসুখবিসুখ হয় নি।'

'মামস? মামস হয়েছিল কি?'

'না, তাও না।'

মিসির আলি বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সেই সময় তিনি কি কোনো অদ্ভুত স্বপ্নটপ্ন দেখতেন?'

বরকত সাহেব ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'মানসিক অবস্থাটা জানবার জন্যে। দেখতেন কি কোনো স্বপ্ন?'

'হ্যাঁ, দেখতেন।'

'কী ধরনের স্বপ্ন, আপনার মনে আছে?'

'ঠিক মনে নেই। প্রায়ই দেখতাম জেগে বসে আছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলে বলত, দুঃস্বপ্ন দেখেছি।'

'কী দুঃস্বপ্ন, সেটা জিজ্ঞেস করেন নি?'

'জ্বি-না, জিজ্ঞেস করি নি। স্বপ্নটপ্নর ব্যাপারে আমার তেমন উৎসাহ নেই। তবে সে নিজে থেকে কয়েক বার আমাকে বলতে চেষ্টা করেছে, আমি তেমন গুরুত্ব দিই

নি।।'

'আপনার কি কিছুই মনে নেই?'

'ও বলত, তার দুঃস্বপ্নগুলি সব গাছপালা নিয়ে। এর বেশি আমার কিছু মনে নেই।'

মিসির আলি বললেন, 'আমি আজ সন্ধ্যায় ঢাকা যাব। এখানকার কাজ আমার আপাতত শেষ হয়েছে। ঢাকায় আমি কিছু পড়াশোনা করব। খোঁজখবর করব, তারপর ফিরে আসব।'

'আজই যাবেন?'

'হ্যাঁ, আজই যাব। হাতে সময় বেশি নেই। কিছু একটা করতে হলে দ্রুত করতে হবে।'

'এ-কথা কেন বলছেন?'

'ইনসটিংক্ট থেকে বলছি। আমার মনে হচ্ছে এ-রকম।'

'আপনি কিন্তু আমার মেয়ের সঙ্গে এক বারই কথা বলেছেন। আমি চাচ্ছিলাম আপনি তার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করবেন।'

'আমি আবার ফিরে আসছি। তখন করব।'

'কবে ফিরবেন?'

'চেষ্টা করব খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে।'

'আমার মেয়েটিকে কেমন দেখলেন, বলুন।'

'এখনো বলবার মতো তেমন কিছু পাচ্ছি না।'

'পাবেন কি?'

'পাব, নিশ্চয়ই পাব। কেন পাব না?'

বরকত সাহেব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মনে হল তিনি খুব আশাবাদী নন।

তিন্নি প্রায় সারাদিনই ছাদে বসে ছিল। মিসির আলি তার কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলেন বিকেলে।

'তিন্নি, আমি চলে যাচ্ছি।'

মেয়েটি বলল, 'আমি জানি।'

'আমি তোমার ছবিগুলি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।'

'তাও জানি।'

'কিছু দিনের মধ্যে আমি আবার আসব। তখন দেখবে, সব ঝামেলা মিটে গেছে।'

তিন্নি কিছু বলল না। মিসির আলি বললেন, 'গাছপালা তুমি খুব ভালবাস, তাই না?'

'মাঝে মাঝে বাসি, মাঝে-মাঝে বাসি না।'

'তুমি কি ওদের সঙ্গে কথা বলতে পার?'

'এখানে যে-সব গাছপালা আছে, তাদের সঙ্গে পারি না।'

'তাহলে কাদের সঙ্গে পার?'

মেয়েটি জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। মিসির আলি বললেন, 'তুমি আমার অনেক প্রশ্নের জবাব দাও না। কেন দাও না বল তো? কোনো বাধা আছে কি?'

তিন্নি সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আপনি আমাকে ভালো করে দিন। অসুখ সারিয়ে দিন।'

মিসির আলির খুবই মন-খারাপ হয়ে গেল। বাচ্চা একটি মেয়ে বাস করছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জগতে—যে-জগতের সঙ্গে আশেপাশের চেনা জগতের কোনো মিল নেই। মেয়েটি কষ্ট পাচ্ছে। তার কষ্টের ব্যাপারটি কাউকে বলতে পারছে না। সে নিজেও হয়তো জানে না পুরোপুরি।

'তিন্নি, আমি যাই?'

মেয়েটি কিছু বলল না। মিসির আলি লক্ষ করলেন, তিন্নি নিঃশব্দে কাঁদছে।

ঢাকায় ফেরার ট্রেনে উঠবার পর মিসির আলির মনে পড়ল, তিন কাপ চায়ের দাম তিনি দিয়ে আসেন নি। রশিদ নামের বুড়ো মানুষটি আগামীকাল ভোরবেলায় যখন দেখবে, কেউ আসছে না, তখন না-জানি কি ভাববে। মিসির আলির মন গ্লানিতে ভরে গেল। কিন্তু কিছুই করার নেই। ঢাকা মেইল ছুটে চলেছে। পেছনে পড়ে আছে নদীর ধারে গড়ে-ওঠা চমৎকার একটি শহর।

৮

ডঃ জাবেদ আহসান অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি আমার কাছে ঠিক কী জানতে চান, বুঝতে পারছি না। কয়েকটি গাছপালার হাতে-আঁকা ছবি দিয়ে গিয়েছেন, আর তো কিছুই বলেন নি।'

'ছবিগুলো ভালো করে দেখেছেন?'

'ভালো করে দেখার কী আছে?'

মিসির আলি লক্ষ করলেন ডঃ জাবেদ বেশ বিরক্ত। ভদ্রলোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসররা তেমন কোনো কাজকর্ম করেন না, কিন্তু সব সময় ব্যস্ততার একটা ভঙ্গি করেন। ডঃ জাবেদ এই মুহূর্তে এমন মুখের ভাব করেছেন, যেন তাঁর মহা মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মিসির আলি বললেন, 'এই গাছগুলি সম্পর্কে কিছু বলুন। ছবিতে আঁকা গাছগুলির কথা বলছি।'

'কী বলব, সেটাই বুঝতে পারছি না। আপনি কী জানতে চাচ্ছেন?'

'এই জাতীয় গাছ দেখেছেন কখনো?'

'না।'

'বইপত্রে এ রকম গাাছের কোনো রেফারেন্স পেয়েছেন?'

'দেখুন, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ ধরনের গাছ আছে। সব কিছু আমার জানার কথা নয়। আমার পিএইচ.ডি.'র বিষয় ছিল প্লান্ট ব্রিডিং। সে-সম্পর্কে আপনাকে আমি কিছু বলতে পারি। আপনি একটি বাচ্চা মেয়ের আঁকা কতগুলি ছবি নিয়ে এসেছেন। সেই ছবিগুলি দেখে আমাকে গাছ সম্পর্কে বলতে বলছেন। এ-ধরনের ধাঁধার পেছনে সময় নষ্ট করার আমি কোনো অর্থ দেখছি না।'

মিসির আলি বললেন, 'আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন?'

'বিরক্ত হচ্ছি, কারণ আপনি আমার সময় নষ্ট করছেন।'

মিসির আলি বললেন, 'আপনি তো বসে-বসে টিভি দেখছিলেন। তেমন কিছু তো করছিলেন না। সময় নষ্ট করার কথা উঠছে না।'

মিসির আলি ভাবলেন, এই কথায় ভদ্রলোক ভীষণ রেগে যাবেন। 'গেট আউট' জাতীয় কথাবার্তাও বলে বসতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তেমন কিছু হল না। ডঃ জাবেদকে মনে হল, তিনি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েছেন। অপ্রস্তুত মানুষেরা যেমন খুব অদ্ভুত ভঙ্গিতে কাশতে থাকে, ভদ্রলোক সে-রকম কাশছেন। কাশি থামাবার পর বেশ মোলায়েম স্বরে বললেন, 'একটু চা দিতে বলি?'

'জ্বি-না, চা খাব না।'

'একটু খান, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পড়েছে। চা ভালোই লাগবে। বসুন, চায়ের কথা বলে আসি।'

চা এল। শুধু চা নয়, চায়ের সঙ্গে নানান রকমের খাবারদাবার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাড়ির এই একটি বিশেষত্ব আছে। এরা অতিথিকে চায়ের সঙ্গে নানান রকম খাবারদাবার দেয়, যা দেখে কেউ ধারণাও করতে পারে না যে, এই সম্প্রদায় আর্থিক দিক দিয়ে পঙ্গু।

'মিসির আলি সাহেব, চা নিন।'

তিনি চা নিলেন।

'বলুন, স্পেসিফিক্যালি আপনি কী জানতে চান।'

'পৃথিবীতে ঠিক এ-জাতীয় গাছ আছে কি না তা কে বলতে পারবে? অর্থাৎ আমি জানতে চাচ্ছি, গাছপালার ক্যাটালগজাতীয় কিছু কি আছে, যেখানে সব-জাতীয় গাছপালার ছবি আছে? তাদের সম্পর্কে তথ্য লেখা আছে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে। এ-দেশে নেই। বোটানিক্যাল সোসাইটিগুলিতে আছে। ওদের একটি কাজই হচ্ছে গাছপালার বিভিন্ন স্পেসিসকে সিসটেমেটিকভাবে ক্যাটালগিং করা।'

'আপনি কি আমাকে কিছু লোকজনের ঠিকানা দিতে পারবেন, যাঁরা আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন?'

'হ্যাঁ, পারি। আপনি যাবার সময় আমি ঠিকানা লিখে দেব। আর কী জানতে চান?'

'মানুষ এবং গাছের মধ্যে পার্থক্য কী?'

'প্রশ্নটা আরো গুছিয়ে করুন।'

মিসির আলি থেমে-থেমে বললেন, 'আমরা তো জানি গাছের জীবন আছে। কিন্তু আমি যা জানতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে, গাছের জীবনের সঙ্গে মানুষের জীবনের মিলটা কোথায়?'

'চট করে উত্তর দেওয়া যাবে না। এর উত্তর দেবার আগে আমাদের জানতে হবে জীবন মানে কি? এখনো আমরা পুরোপুরি ভাবে জীবন কী তা-ই জানি না।'

'বলেন কী। জীবন কী জানেন না!'

'হ্যাঁ, তাই। বিজ্ঞান অনেক দূর আমাদেরকে নিয়ে গেছে, কিন্তু এখনো অনেক কিছু আমরা জানি না। অনেক আনসলভ্‌ড্ মিস্ট্রি রয়ে গেছে। আপনাকে আরেক কাপ

চা দিতে বলি?'

'বলুন।'

ডঃ জাবেদ সিগারেট ধরিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, 'অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে গাছের মিল অনেক বেশি।'

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ, তাই। আসল জিনিস হচ্ছে 'জীন', যা ঠিক করে কোন প্রোটিন তৈরি করা দরকার। অনেকগুলি জীন নিয়ে হয় একটি ডিএনএ মলিক্যুল। ডিওক্সি রিবো নিউক্লিয়িক অ্যাসিড। প্রাণের আদি ব্যাপার হচ্ছে এই জটিল অণু। এই অণু থাকে জীব-কোষে। তারা ঠিক করে একটি প্রাণী মানুষ হবে, না গাছ হবে, না সাপ হবে। মাইটোকনড্রিয়া বলে একটি জিনিস মানুষেরও আছে, আবার গাছেরও আছে। মানুষের যা নেই, তা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাসট।'

'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারার কথাও নয়। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। আপনি চাইলে, আমি আপনাকে কিছু সহজ বইপত্র দিতে পারি।'

'আমি চাই। আপনি আমাকে আরো কিছু বলুন।'

'ডিএনএ প্রসঙ্গেই বলি। এই অণুগুলি হচ্ছে প্যাঁচাল সিঁড়ির মতো। মানুষের ডিএনএ এবং গাছের ডিএনএ প্রায় একই রকম। সিঁড়ির দু'-একটা ধাপ শুধু আলাদা। একটু অন্য রকম।'

মিসির আলি গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন। এক জন ভালো শিক্ষক খুব সহজেই একজন মনোযোগী শ্রোতাকে চিনতে পারেন।

ডঃ জাবেদ এই মনোযোগী শ্রোতাকে পছন্দ করে ফেললেন।

'শুধু এই দু'-একটি ধাপ অন্য রকম হওয়ায় প্রাণিজগতে মানুষ এবং গাছ আলাদা হয়ে গেছে। প্রোটিন তৈরির পদ্ধতি হয়েছে ভিন্ন। আপনি আগে বরং কয়েকটা বইপত্র পড়ুন। তারপর আবার আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

ডঃ জাবেদ তিনটি বই দিলেন। দু'টি ঠিকানা লিখে দিলেন। একটি লন্ডনের রয়েল বোটানিক্যাল সোসাইটির, অন্যটি ডঃ লংম্যানের। ডঃ লংম্যান আমেরিকান এগ্রিকালচারাল রিসার্চের ডেপুটি ডাইরেক্টর।

মিসির আলি সাহেব তাঁর সঙ্গের ছবিগুলি দু' ভাগ করে দু' জায়গায় পাঠালেন। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, দশদিনের মাথায় ডঃ লংম্যান-এর চিঠির জবাব চলে এল।

টমাস লংম্যান
Ph.D. D. Sc.
US Department of Agricultural Science
ND 505837 USA

প্রিয় এম. আলি,

আপনার পাঠানো ছবি এবং চিঠি পেয়েছি। যে সমস্ত লতানো গাছের ছবি আপনি পাঠিয়েছেন, তা খুব সম্ভব কল্পনা থেকে আঁকা। আমাদের জানা মতে ও রকম গাছের কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে পেরুর গহীন অরণ্যে এবং আমেরিকার রেইন

ফরেস্টে কিছু লতানো গাছ আছে, যার সঙ্গে আপনার পাঠানো গাছের সামান্য মিল আছে। আমি আপনাকে কিছু ফটোগ্রাফ পাঠালাম, আপনি নিজেই মিলিয়ে দেখতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি, রেইন ফরেস্ট এবং পেরুর গাছগুলির রঙ সবুজ, কিন্তু আপনার পাঠানো ছবির গাছের বর্ণ হলুদ এবং লালের মিশ্রণ। এর বেশি আপনাকে আর কোনো তথ্য দিতে পারছি না।

আপনার বিশ্বস্ত
টি. লংম্যান।

পুনশ্চ : আপনি যদি আপনার ছবির মতো গাছের কিছু নমুনা পাঠান, তাহলে আমরা তা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পরীক্ষা করব।

রয়েল বোটানিক্যাল সোসাইটি চিঠির জবাব দিতে কুড়ি দিনের মতো দেরি করল। তাদের জবাবটি ছিল এক লাইনের।

প্রিয় ডঃ এম. আলি,
আপনার পাঠানো ছবির মতো দেখতে কোনো গাছের কথা আমাদের জানা নেই।

আপনার বিশ্বস্ত,
এ. সুরনসেন।

মিসির আলি সাহেব এই ক'দিনে জীবনের উৎপত্তি এবং বিকাশের উপর গোটা চারেক বই পড়ে ফেললেন। ডিএনএ এবং আরএনএ মলিকুল সম্পর্কে পড়তে গিয়ে লক্ষ করলেন, প্রচুর কেমিষ্ট্রি জানা ছাড়া কিছু স্পষ্ট হচ্ছে না। বারবার এ্যামিনো অ্যাসিডের কথা আসছে। এ্যামিনো অ্যাসিড কী জিনিস তা তিনি জানেন না। অথচ বুঝতে পারছেন, প্রাণের রহস্যের সঙ্গে এ্যামিনো অ্যাসিডের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মিসির আলি নাইন টেনের পাঠ্য কেমিষ্ট্রি বই কিনে এনে পড়া শুরু করলেন। কোমর বেঁধে পড়াশোনা যাকে বলে। এই ফাঁকে চিঠি লিখলেন তিন্নির বাবাকে। তিন্নির বাবা তার জবাব দিলেন না। তবে তিন্নি একটি চিঠি লিখল। কোনো রকম সম্বোধন চিঠিতে নেই। হাতের লেখা অপরিচ্ছন্ন। প্রচুর ভুল বানান। কিন্তু ভাষা এবং বক্তব্য বেশ পরিষ্কার। খুবই গুছিয়ে লেখা চিঠি, বাচ্চা একটি মেয়ের জন্যে যা বেশ আশ্চর্যজনক। চিঠির অংশবিশেষ এ-রকম...

আপনি আব্বাকে একটি লম্বা চিঠি লিখেছেন। আব্বা সেই চিঠি না-পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। আব্বা এখন আর আপনাকে পছন্দ করছেন না। তিনি চান না, আপনি আমার ব্যাপারে আর কোনো চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু আমি জানি, আপনি করছেন। যদিও আপনি অনেক দূরে থাকেন, তবু আমি বুঝতে পারি। আপনি যে আমাকে পছন্দ করেন, তাও বুঝতে পারি। কেউ আমাকে পছন্দ করে না, কিন্তু আপনি করেন। কেন

করেন? আমি তো ভালো মেয়ে না। আমি সবাইকে কষ্ট দিই। সবার মাথায় যন্ত্রণা দিই। কাউকে আমার ভালো লাগে না। আমার শুধু গাছ ভালো লাগে। আমার ইচ্ছা করে, একটা খুব গভীর জঙ্গলের মাঝখানে গিয়ে বসে থাকি। গাছের সঙ্গে কথা বলি। গাছেরা কত ভালো। এরা কখনো এক জন অন্য জনের সঙ্গে ঝগড়া করে না, মারামারি করে না। নিজের জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, এবং ভাবে। কত বিচিত্র জিনিস নিয়ে তারা ভাবে। এবং মাঝে–মাঝে এক জনের সঙ্গে অন্য জন কথা বলে। কী সুন্দর সেই সব কথা। এখন আমি মাঝে–মাঝে ওদের কথা শুনতে পাই।

চিঠি এই পর্যন্তই। মিসির আলি এই চিঠিটি কম হলেও দশ বার পড়লেন। চিঠির কিছু অংশ লাল কালি দিয়ে দাগ দিলেন। যেমন একটি লাইন-- 'এখন আমি মাঝে–মাঝে ওদের কথা শুনতে পাই।' স্পষ্টতই মেয়েটি গাছের কথা বলছে। পুরো ব্যাপারটাই সম্ভবত শিশুর কল্পনা। শিশুদের কল্পনার মতো বিশুদ্ধ জিনিস আর কিছুই নেই। মিসির আলির নিজের এক ভাগনী অমিতা গাছের সাথে কথা বলত। ওদের বাড়ির সামনে ছিল একটা খাটো কদমগাছ। অমিতাকে দেখা যেত গাছের সামনে উবু হয়ে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করছে। মিসির আলি এক দিন আড়ালে বসে কথাবার্তা শুনলেন।

'কিরে, আজ তুই এমন মুখ কালো করে রেখেছিস কেন? রাগ করেছিস? তুই এমন কথায়–কথায় রাগ করিস কেন? কেউ বকেছে? কী হয়েছে বল তো ভাই শুনি।'

অমিতা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। যেন সে সত্যি–সত্যি শুনতে পাচ্ছে গাছের কথা। মাঝে–মাঝে মাথা নাড়ছে। এক সময় সে উঠে দাঁড়াল এবং বিকট চিৎকার করে বলল, 'কে কদমগাছকে ব্যথা দিয়েছে? কে পাতাসুদ্ধ তার ডাল ছিঁড়েছে?' কান্নাকাটি আর চিৎকার। জানা গেল আগের রাতে সত্যি–সত্যি কদমগাছের একটি ডাল ভাঙা হয়েছে। ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক। কিছুদিন পর গাছটি আপনা–আপনি মরে যায়। অমিতা নাওয়া–খাওয়া বন্ধ করে বড় অসুখে পড়ে যায়। জীবন–মরণ অসুখ। মাসখানিক ভুগে সেরে ওঠে। গাছপ্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়।

মিসির আলি ঠিক করলেন, অমিতার সঙ্গে দেখা করবেন। ছোটবেলার কথা জিজ্ঞেস করবেন। যদিও এটা খুবই সম্ভব যে, অমিতার শৈশবের কথা কিছু মনে নেই। সে এখন থাকে কুমিল্লার ঠাকুরপাড়ায়। তার স্বামী পুলিশের ডিএসপি। সে নিজে কোনো এক মেয়ে–স্কুলে পড়ায়। মিসির আলি ঠিক করলেন, অমিতার সঙ্গে দেখা করেই চলে যাবেন ময়মনসিংহ। তিন্নির সঙ্গে কথা বলবেন। দু'–একটা ছোটখাটো পরীক্ষাটরীক্ষা করবেন। তিন্নির মার আত্মীয়স্বজনের খোঁজ বের করতে চেষ্টা করবেন। তিন্নিকে দিয়ে আরো কিছু ছবি আঁকিয়ে পাঠাবেন ডঃ লংম্যানের কাছে। অনেক কাজ সামনে। মিসির আলি দু'মাসের অর্জিত ছুটির জন্যে দরখাস্ত করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চাকরির পদটি হচ্ছে অস্থায়ী। পার্ট টাইম শিক্ষকতার পদ। দু' মাসের ছুটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেবে না। হয়তো চাকরি চলে যাবে। কিন্তু উপায় কী? এই রহস্য তাঁকে ভেদ করতেই হবে। ছোট্ট একটি মেয়ে কষ্ট পাবে, তা হতেই পারে না।

৯

অমিতা অবাক হয়ে বলল, 'আরে মামা, তুমি!'

মিসির আলি বললেন, 'চিনতে পারছিস রে বেটি?'

'কী আশ্চর্য মামা, তোমাকে চিনব না! তোমাকে নিয়ে কত গল্প করি মানুষের সাথে।'

তিনি হাসলেন। অমিতা বলল, 'বিনা কারণে তুমি আমার কাছে আস নি। তুমি সেই মানুষই না। কি জন্যে এসেছ বল।'

'এখনি বলব?'

'না, এখন না। আমি স্কুলে যাচ্ছি। আজ আর ক্লাস নেব না, ছুটি নিয়ে চলে আসব। তুমি ততক্ষণে গোসলটোসল করে বিশ্রাম নাও। আমার ঘর-সংসার দেখ। ঘন-ঘন চা খাওয়ার অভ্যাস এখনো আছে?'

'হুঁ, আছে।'

'কাজের ছেলেটাকে বলে যাচ্ছি, সে প্রতি পনের মিনিট পরপর চা দেবে।'

'তোর ছেলেপুলে কই?'

অমিতা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার ছেলেপুলে নেই মামা, হবেও না কোনো দিন। তুমি তো খোঁজখবর রাখ না, কাজেই কিছু জান না। যদি জানতে, তাহলে আর.......'

সে কথা শেষ করল না। মিসির আলি লক্ষ করলেন, মেয়েটির গলা ভারি হয়ে এসেছে। কত রকম দুঃখ-কষ্ট মানুষের থাকে! তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল।

'তোর বর কোথায়?'

'ও টুরে গেছে—চৌদ্দগ্রামে। সন্ধ্যাবেলায় ফিরবে। তুমি কি থাকবে সন্ধ্যা পর্যন্ত?'

'না, আমার একটা জরুরি কাজ আছে।'

'তা তো থাকবেই। তোমাকে যে আমি কত ভালবাসি মামা, অথচ তুমি--'

অমিতার গলা আবার ভারি হয়ে গেল। এই মেয়েটার মনটা অসম্ভব নরম।

মিসির আলি গোসল সেরে ঘুরে-ঘুরে অমিতার ঘর-সংসার দেখলেন। বিরাট দোতলা বাড়ি। প্রতিটি ঘর চমৎকার করে সাজানো। লাইব্রেরি-ঘরটি দেখে তাঁর মন ভরে গেল। বই বই আর বই। তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে।

কাজের ছেলেটির নাম চেরাগ মিয়া। সে সত্যি-সত্যি পনের মিনিট পরপর চা নিয়ে আসে। দু' কাপ চা খেয়ে মিসির আলি ধমক দিলেন 'আর লাগবে না। দরকার হলে আমি চাইব।' লাভ হল না। পনের মিনিট পর আবার সে এক কাপ চা নিয়ে এল।

দুপুরে খেতে বসে অমিতার সঙ্গে তিনি গাছের সঙ্গে কথা বলার প্রসঙ্গটা তুললেন। অমিতা অবাক হয়ে বলল, 'এইটি জানবার জন্যে তুমি এসেছ আমার কাছে?'

'হঁ।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি মামা? পাগলরাই শুধু এইসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ছোটাছুটি করে।'

'পাগল হই আর যা-ই হই, যা জানতে চাচ্ছি সেটা বল। তুই যে ছোটবেলায় গাছের সঙ্গে কথা বলতি, সেটা মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'আচ্ছা, গাছ কি তোর সঙ্গে কথা বলত?'

অমিতা হাসিমুখে বলল, 'গাছ আমার সঙ্গে কথা বলবে কি? গাছ আবার কথা বলা শিখল কবে?'

'তার মানে, গাছের কোনো কথা তুই শুনতে পেতি না?'

'কীভাবে শুনব মামা? তুমি শুনতে পাও? এইসব ছোটবেলার খেয়াল। এটা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন?'

'এমনি।'

'উঁহু। এমনি–এমনি মাথা ঘামাবার মানুষ তুমি না। নিশ্চয়ই কিছু–একটা আছে, যা তুমি আমাকে বলতে চাচ্ছ না। ও কি মামা, তোমার কি খাওয়া হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'অসম্ভব। এগার পদ রান্না করেছি। তুমি খেয়েছ মাত্র পাঁচ পদ। এখনো ছ'টা পদ বাকি আছে।'

'মরে যাব অমিতা।'

'মরে যাও আর যাই কর-- খেতে হবে। জোর করে আমি মুখে তুলে খাইয়ে দেব। আমাকে তুমি চেন না মামা।'

মিসির আলি হাসলেন। অমিতা গম্ভীর মুখে বসে আছে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, সে সত্যি–সত্যি জোর করে মুখে তুলে দেবে। মিসির আলি মৃদু স্বরে বললেন, 'গাছ তাহলে তোর সঙ্গে কোনো কথা বলত না?'

অমিতা বিরক্ত স্বরে বলল, 'না। গাছ আমার সঙ্গে কেন কথা বলবে বল তো? আমি কি গাছ? ভালো করে তাকিয়ে দেখ তো আমার দিকে, আমাকে কি গাছ বলে মনে হয়?'

মিসির আলি কিছু বললেন না। তাকিয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে। তাঁর এই ভাগনীটি ভারি সুন্দর। দেবীর মতো মুখ। ঘন কালো তরল চোখ। মুখের ভাবটি বড় স্নিগ্ধ।

অমিতা বলল, 'মামা, তুমি মানুষের দুঃখ–কষ্ট দূর করবার জন্যে ছোটাছুটি কর, অথচ তোমার আশেপাশে যারা আছে, তাদের কথা কিছুই ভাব না।'

'ভাবি না কে বলল?'

'না, ভাব না। ভাবলে এই ছ' বছরে একবার হলেও আসতে আমার কাছে।'

মিসির আলি দেখলেন, অমিতার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মেয়েগুলি এত নরম স্বভাবের হয় কেন, এই নিয়ে অন্যমনস্কভাবে তিনি খানিকক্ষণ ভাবলেন। একটি মেয়ের ডিএনএ এবং একটি পুরুষের ডিএনএ–র মধ্যে তফাৎ কী, তাঁর জানতে ইচ্ছে হল। পড়াশোনা করতে হবে, প্রচুর পড়াশোনা। জীবন এত ছোট, অথচ কত কি আছে জানার!

১০

তিন্নি আজ সারা দিন ছাদে বসে আছে। সে ছাদে গিয়েছে সূর্য ওঠার আগে। এখন প্রায় সন্ধ্যা, কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য ডুবে যাবে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এক বারও সে নিজের জায়গা থেকে নড়ে নি। তার ছোট্ট শরীরটি পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে। মাঝে-মাঝে বাতাসে তার চুল উড়ছে। এ থেকেই মনে হয়—এটি পাথরের মূর্তি নয়, জীবন্ত একজন মানুষ। সকালে কাজের মেয়ে নাশতা নিয়ে ছাদে এসে ক্ষীণ গলায় বলেছিল, 'আপা, নাশতা আনছি।'

তিন্নি কোনো জবাব দেয় নি। কাজের মেয়েটি আধ ঘন্টার মতো অপেক্ষা করল। এর মধ্যে কয়েক বার নাশতা খাবার কথা বলল। তিন্নির কোনো ভাবান্তর হল না।

দুপুরবেলা বরকত সাহেব নিজেই এলেন। শান্ত গলায় বললেন, 'খেতে এস মা।'

তিন্নি নিশ্চুপ। বরকত সাহেব তার হাত ধরলেন। হাত গরম হয়ে আছে। বেশ গরম। যেন মেয়েটির এক শ' তিন বা চার জ্বর উঠেছে। তিনি গাঢ় স্বরে বললেন, 'তোমার কি শরীরটা খারাপ মা?'

তিন্নি না-সূচক মাথা নাড়ল।

'এস, ভাত দেওয়া হয়েছে। দু' জনে মিলে খাই।'

সে আবার না-সূচক মাথা নাড়ল। বরকত সাহেব মেয়েকে নিজের দিকে টানতেই হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলেন। যেন হাজার ভোল্টের ইলেক্‌ট্রিসিটি চলে গেল কপালের মাঝখান দিয়ে। তিনি মেয়ের হাত ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তিন্নি তখন খুব সহজ গলায় বলল, 'বাবা, তুমি চলে যাও।'

'চলে যাব?'

'হুঁ।'

'তুমি আসবে না?'

'না।'

'কিছু খাবে না?'

'খিদে নেই।'

'এক গ্লাস দুধ খাও। দুধ পাঠিয়ে দিই?'

'না।'

বরকত সাহেব নিচে গেলেন। এ কী গভীর পরীক্ষায় তিনি পড়লেন। মেয়ের এই বিচিত্র অসুখের সত্যি কি কোনো সমাধান আছে? তাঁর মনে হতে লাগল, সমাধান নেই। এই অসুখ বাড়তেই থাকবে, কমবে না। মিসির আলি নামের মানুষটির কিছুই করার ক্ষমতা নেই। মেয়েটিকে নিয়ে বিদেশে চলে গেলে কেমন হয়? ইউরোপ-আমেরিকার বড়-বড় ডাক্তাররা আছেন। তাঁরা দিনকে রাত করতে পারেন--এই সামান্য কাজটা পারবেন না? খুব পারবেন। তিনি নিজে দুপুরে কিছু খেতে পারলেন না। মাথায় ভোঁতা যন্ত্রণা হতে লাগল। বিকেলের দিকে সেই যন্ত্রণা খুব বাড়ল। তিনি কয়েক বার বমি করলেন। অসম্ভব রাগে তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। কার উপর রাগ? সম্ভবত নিজের ভাগ্যের উপর। এত খারাপ ভাগ্যও মানুষের হয়?

তিন্নি সন্ধ্যা মেলাবার পর নিজের ঘরে ঢুকল। আজ অনেক দিন পর তার আবার

ছবি আঁকতে ইচ্ছা হচ্ছে। রঙ–তুলি সাজিয়ে সে উবু হয়ে মেঝেতে বসল। তার সামনে বড় একটি কাগজ বিছানো। সে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে, অতি দ্রুত তুলি বোলাতে শুরু করল। প্রথমে মনে হচ্ছিল, কিছু লাইন এলোমেলোভাবে টানা হচ্ছে। এখন আর তা মনে হচ্ছে না। এখন কাগজে লতানো গাছের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আকাশে দু'টি সূর্য। তার আলো তেরছাভাবে গাছগুলির উপর পড়েছে।

তিন্নি মৃদুস্বরে বলল, 'তোমরা কেমন আছ?'

ছবির গাছগুলি যেন উত্তরে কিছু বলল। তিন্নি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার কিছু ভালো লাগছে না। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, খুব কষ্ট।'

গাছগুলি যেন তার উত্তরেও কিছু বলল। খুব কঠিন কোনো কথা। কারণ তিন্নিকে দেখা গেল দু' হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠেছে। সেই কান্না দীর্ঘস্থায়ী হল না। সে ছবিটি কুচিকুচি করে দিয়ে শান্ত হয়ে নিচে নেমে গেল। কারণ সে বুঝতে পারছে, তার বাবা ঠিক এই মুহূর্তে তাকে নিয়ে ভাবছেন। সেই ভাবনাগুলি ভালো নয়। তার বাবা সমস্যার কাছ থেকে মুক্তি চান। কিন্তু যে–পথ তিনি বেছে নিতে চাচ্ছেন তাতে কোনো লাভ হবে না।

'বাবা।'

বরকত সাহেব চমকে ফিরলেন। তাঁর ঘর অন্ধকার। তিনি ইজিচেয়ারে মাথা নিচু করে বসে আছেন। তিন্নি তাঁর সামনের খাটে পা ঝুলিয়ে বসল। বরকত সাহেব অস্বস্তির সঙ্গে তাঁর মেয়ের দিকে তাকাতে লাগলেন।

'কিছু বলবে?'

'বলব।'

'বল শুনি। চেয়ারে বস। বসে বল।'

তিন্নি খুব নরম গলায় বলল, 'তুমি আমাকে বাইরে নিয়ে যেতে চাও?'

'হুঁ। বড় ডাক্তার দেখাব। পৃথিবীর সেরা ডাক্তার।'

'ডাক্তার কিছু করতে পারবে না।'

'কী করে বুঝলে?'

'আমি জানি। আমার কোনো অসুখ করে নি। আমি তোমাদের মতো না, আমি অন্য রকম।'

'সেটা আমি জানি।'

'না, তুমি জান না। সবটা জান না।'

'ঠিক আছে, না জানলে জানি না। এত কিছু জানার আমার দরকার নেই। আমার টাকার অভাব নেই। তোমাকে আমি বড়–বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। ইউরোপ। আমেরিকা।'

'আমি এইখানেই থাকব। আমি কোথাও যাব না।'

বরকত সাহেব কড়া চোখে তাকালেন। তাঁর নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। কপালে ঘাম জমতে লাগল। তিন্নি বলল, 'তোমরা কিছুতেই আমাকে এখান থেকে নিতে পারবে না। তোমাদের সেই শক্তি নেই।'

বরকত সাহেব কিছু বললেন না। তিন্নি শান্ত সুরে বলল, 'এই বাড়িটাতে আমি একা থাকতে চাই বাবা।'

'একা থাকতে চাই মানে?'

'আমি একা থাকব। আর কেউ না।'

'কী বলছ এসব!'

তিন্নি জবাব না-দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বরকত সাহেব কড়া গলায় বললেন, 'পরিষ্কার করে বল, তুমি কী বলতে চাও।'

'এই বাড়িটাতে আমি একা থাকব। আর কেউ থাকবে না। কাজের লোক, দারোয়ান, মালী, এদের সবাইকে বিদায় করে দাও। তুমিও চলে যাও। তুমিও থাকবে না।'

'আমিও চলে যাব!'

'হ্যাঁ।'

বরকত সাহেব উঠে এসে মেয়ের গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলেন। তিন্নি কিছুই বলল না। শান্ত পায়ে উঠে চলে গেল। বরকত সাহেব লক্ষ করলেন, তিন্নি বাগানে চলে যাচ্ছে। বাগান এখন ঘন অন্ধকার। বর্ষার পানি পেয়ে ঝোপঝাড় বড় হয়ে উঠেছে। সাপখোপ নিশ্চয়ই আছে। এই মেয়ে এখন এই সাপখোপের মধ্যে একা-একা হাঁটবে। অসহ্য, অসহ্য! কিন্তু করার কিছুই নেই। তাঁর মনে হল, মেয়েটি মরে গেলে তিনি মুক্তি পান। জন্মের পরপর তিন্নির জন্ডিস হয়েছিল। গা হলুদ হয়ে মরমর অবস্থা। মেয়েকে ঢাকা পিজিতে নিয়ে যেতে হয়েছিল। বহু কষ্টে তাকে সারিয়ে তোলা হয়েছে। সেই সময় কিছু-একটা হয়ে গেলে, আজ এই ভয়াবহ কষ্ট সহ্য করতে হত না।

তিনি কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ঘরের ভেতর পায়চারি করলেন। এক বার ভাবলেন বাগানে যাবেন। কিন্তু সেই চিন্তা দীর্ঘস্থায়ী হল না। কী হবে বাগানে গিয়ে? তিনি কি পারবেন এই মেয়েকে ফেরাতে? পারবেন না। সেই ক্ষমতাই তাঁর নেই। হয়তো কারোরই নেই। পীর-ফকির ধরলে কেমন হয়? তিনি নিজে এইসব বিশ্বাস করেন না। সারা জীবন তিনি ভেবেছেন, অস্বাভাবিক কোনো ক্ষমতা মানুষের নেই, থাকতে পারে না। কিন্তু এখন দেখছেন, তাঁর ধারণা সত্যি নয়। অস্বাভাবিক ক্ষমতা মানুষের থাকতে পারে। তিন্নিরই আছে। কাজেই পীর-ফকিরের কাছে বা সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে যাওয়া যেতে পারে।

'স্যার।'

'কে?'

তিনি দেখলেন, চায়ের পেয়ালা হাতে নিজাম দাঁড়িয়ে আছে। তিনি চায়ের পেয়ালা হাতে নিলেন। নিজাম বলল, 'ঐ লোকটা আসছে।'

'কোন লোক?'

'আগে যে ছিলেন।'

'ও, মিসির আলি?'

'জ্বি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

বরকত সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, 'দেখা করার কোনো দরকার নেই। আমি এখন ঘর থেকে বেরুব না। ভদ্রলোককে তাঁর ঘর দেখিয়ে দাও। খাবারদাবারের ব্যবস্থা কর। আর তিনি যদি তিন্নির সঙ্গে দেখা করতে চান, তাহলে তিন্নিকে খবর দাও। তিন্নি বাগানে গিয়েছে।'

নিজাম চলে গেল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড়বৃষ্টি হবে বোধহয়। বাতাস ভারি হয়ে আছে। চারদিকে অসহ্য গুমট।

মিসির আলি এসেছেন সন্ধ্যাবেলায়, এখন রাত এগারটা। কিছুক্ষণ আগেই রাতের খাবার শেষ করেছেন। প্রায় চার ঘন্টার মতো হল, তিনি এ বাড়িতে আছেন। নিজাম এর মধ্যে দু' বার জিজ্ঞেস করেছে, সে তিন্নিকে খবর দেবে কি না। তিনি বলেছেন, খবর দেবার দরকার নেই। কারণ তিন্নি নিশ্চয়ই জানে যে তিনি এসেছেন। আলাদা করে বলার কোনোই প্রয়োজন নেই।

'তিন্নি আছে কোথায়?'

'বাগানে।'

'এই রাতের বেলায় বাগানে কী করছে!'

'জানি না স্যার। কয়েক দিন ধরে সন্ধ্যার পর বাগানে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত থাকে।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি স্যার।'

'এত রাত পর্যন্ত বাগানে সে কী করে?'

'বাড়ির পিছনের দিকে একটা বড়ই গাছ আছে। সেই বড়ই গাছের কাছে একটা গর্ত, ঐখানে চুপচাপ দাঁড়ায়ে থাকে।'

'ও, আচ্ছা।'

মিসির আলির মুখ দেখে মনে হল, তিনি এই খবরে তেমন অবাক হন নি। বেশ সহজভাবে বললেন, 'তুমি বারান্দায় আমাকে একটা চেয়ার দাও। বারান্দায় বসে আকাশের শোভা দেখি। আর শোন, ভালো করে এক কাপ চা দিও। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টি হবে বোধহয়।'

'জ্বি।'

মিসির আলি বারান্দায় এসে বসবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই টুপটুপ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করল। মিসির আলি অপেক্ষা করতে লাগলেন, কখন তিন্নি বেরিয়ে আসবে। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। এ-রকম একটি ঝড়-জলের রাতে বাচ্চা একটি মেয়ে একা-একা বাগানে। কত রকম অদ্ভুত সমস্যা আমাদের চারদিকে। মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছে। কেরোসিনের বাহারি ল্যাম্প জ্বালানো হয়েছে। নিজাম একটি ল্যাম্প বাইরে নিয়ে আসতেই হাওয়া লেগে সেটি দপ করে নিভে গেল। ঠিক তখন মিসির আলি দেখলেন, তিন্নি বের হয়ে আসছে। ভিজে চুপসে গিয়েছে মেয়েটি। তিন্নিই তাঁকে দেখেছে। সে এগিয়ে এল মিসির আলির দিকে।

'আপনি কখন এসেছেন?'

'অনেকক্ষণ হল। তুমি বুঝতে পার নি?'

'না। এখন দেখলাম।'

মিসির আলি বেশ অবাক। মেয়েটি বুঝতে পারল না কেন? টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা কি নষ্ট হয়ে গেছে?

নিজাম হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। মিসির আলি বললেন, 'তিন্নি, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এস, আমরা গল্প করি। ঝড়বৃষ্টির রাতে গল্প করতে বেশ ভালো লাগে। আর নিজাম, তুমি আমাদের দু' জনের জন্যে চা নিয়ে এস। তিন্নি, তুমি চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে?'

'না।'

নিজাম ফিসফিস করে বলল, 'আপা আজ সারাদিন কিছু খায় নাই।'

মিসির আলি বললেন, 'তাহলে কিছু খাবারও নিয়ে এস। হালকা কোনো খাবার।'

'না, আমি কিছুই খাব না, খিদে নেই।'

'ঠিক আছে, না খেলে। এস, গল্প করি। যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এস। তোমার সমস্ত পা কাদায় মাখামাখি।'

তিন্নি চলে গেল। নিজাম এক পট চা এনে রাখল সামনে। মিসির আলি অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু মেয়েটি সে রাতে আর তাঁর কাছে এল না। খুব ঝড় হল সারা রাত। শোঁ-শোঁ করে হাওয়া বইতে থাকল। মিসির আলি অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুতে পারলেন না। তাঁর বারবার মনে হতে লাগল, হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি যোগাযোগ করবে তাঁর সঙ্গে। দু' জন দু' জায়গায় বসে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করবেন। কিন্তু তা হল না।

সূর্য এখনো ওঠে নি। মিসির আলি দ্রুত পা ফেলছেন। ব্রহ্মপুত্র নদী মনে হচ্ছে এখনো ঘুমিয়ে। দিনের কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয় নি। কাল রাতের বৃষ্টির জন্যেই বুঝি চারদিক ঝিলমিল করছে। মিসির আলি গত রাতটা প্রায় অঘুমেই কাটিয়েছেন। কিন্তু তার জন্যে খারাপ লাগছে না। শরীরে কোনো ক্লান্তি নেই, তিনি খুঁজছেন চা-ওয়ালাকে। পাওনা টাকাটা দিয়ে দেবেন। গল্পগুজব করবেন। তাঁর মনে একটা আশঙ্কা ছিল, হয়তো এই চাওয়ালা বুড়োর আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। বাকি জীবন মনের মধ্যে এই ক্ষুদ্র ঘটনা কাঁটার মত বিঁধে থাকবে। আশঙ্কা সত্যি হল না। বুড়োকে পাওয়া গেল। কেতলিতে চায়ের পানি ফুটে উঠেছে। কেতলির নল দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বুড়োর মুখ হাসি-হাসি।

'কেমন আছেন বুড়োমিয়া?'

'আল্লায় যেমন রাখছে। আপনের শইল বালা?'

'জ্বি, ভালো। আমাকে চিনতে পারছেন না? ঐ যে চা খেয়ে পয়সা না দিয়ে চলে গেলাম।'

বুড়ো হেসে ফেলল। মিসির আলি বললেন, 'জরুরি কাজে ঢাকায় চলে গিয়েছিলাম। কাল এসেছি। আপনার টাকা নিয়ে এসেছি। চা কি হয়েছে?'

বুড়ো চায়ের কাপে লিকার ঢালতে লাগল। মিসির আলি বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই মনে-মনে আমাকে খুব গালাগালি করেছেন।'

'জ্বি-না মিয়াসাব। অত অল্প কারণে কি আর গাইল দেওন যায়? আমি জানতাম আপনে আইবেন।'

'কী করে জানতেন?'

'বুঝা যায়।'

এই কথাটি ঠিক। অনেক কিছুই বোঝা যায়। রহস্যময় উপায়ে বোঝা যায়। চায়ের

কাপে চুমুক দিয়ে মিসির আলির মনে হল, তিন্নির ব্যাপার তিনি খানিকটা বুঝতে পারছেন। আবছাভাবে বুঝছেন।

'কি ভাবেন মিয়াসাব?'

'না, কিছু না। উঠি।'

মিসির আলি চায়ের দাম মিটিয়ে রওনা হবেন, ঠিক তখন মাথা ঝিম করে উঠল। তিন্নির পরিষ্কার রিনরিনে গলা, 'আপনি ভালো আছেন?' মিসির আলি আবার বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। বুড়ো বলল, 'কি হইছে?'

'শরীরটা একটু খারাপ লাগছে। আমি খানিকক্ষণ বসি?'

'বসেন, বসেন।'

মিসির আলি মনে-মনে তিন্নির সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

'গত রাতে তুমি আস নি কেন?'

'ইচ্ছা করছিল না।'

'না এসেও তো কথা বলতে পারতে। তাও বল নি।'

'ইচ্ছা করছিল না।'

'এখন ইচ্ছা করছে?'

'হ্যাঁ করছে। কথা বলতে ইচ্ছা করছে।'

'বল, কথা বল। আমি শুনছি।'

'আমি এখন এখানকার গাছের কথা বুঝতে পারি।'

'বাহ্, চমৎকার তো!'

'তাই রোজ সন্ধ্যাবেলায় বাগানে যাই। ওদের কথা শুনি।'

'দিনের বেলা শুনতে পাও না?'

'না, দিনের বেলায় ওরা কোনো কথা বলে না, চুপ করে থাকে। ওরা কথা বলে শুধু সন্ধ্যার দিকে। রাতে আবার চুপ করে যায়। ওরা তো আর মানুষের মতো না, যে, সারা দিন বকবক করবে।'

'তা তো ঠিকই। ওরা কী কথা বলে তোমার সঙ্গে?'

'আমার সঙ্গে তো কোনো কথা বলে না। ওরা কথা বলে নিজেদের মধ্যে, আমি শুনি।'

'কী নিয়ে কথা বলে?'

'অদ্ভুত জিনিস নিয়ে কথা বলে। বেশির ভাগই আমি বুঝতে পারি না।'

'তবু বল। আমার শুনতে ইচ্ছা করছে।'

'জীবন কী, জীবনের মানে কী-- এইসব নিয়ে তারা কথা বলে। নিজেদের মধ্যে কথা বলে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আর কথা বলে মানুষদের নিয়ে। পশুপাখিদের নিয়ে। এরা পৃথিবীর মানুষদের কথা জানে। এরা কী বলে, কী করে--এইসব জানে। মানুষদের নিয়ে ভাবে।'

'বাহ্, চমৎকার তো!'

'একটা গাছ যখন মারা যায়, তখন সারা জীবনে যা জানল--তা অন্য গাছদের জানিয়ে যায়। মানুষদের যখন কষ্ট হয়, তখন তাদের কষ্ট হয়। মানুষদের যখন আনন্দ

হয়, তখন তাদেরও আনন্দ হয়।'

'মানুষ যখন একটা গাছকে কেটে ফেলে বা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে, তখন তারা মানুষদের উপর রাগ করে না?'

'না। তারা রাগ করতে পারে না। তারা তো মানুষের মতো নয়। তারা শুধু ভালবাসে। জানেন, তাদের মনে খুব কষ্ট।'

'কেন বল তো?'

'কারণ, খুব শিগগিরই পৃথিবীতে কোনো মানুষ থাকবে না। কোনো জীব থাকবে না। পৃথিবী আস্তে-আস্তে গাছে ভরে যাবে। এই জন্যেই তাদের দুঃখ।'

'মানুষ থাকবে না কেন?'

'এরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যাবে। অ্যাটম বোমা ফাটাবে। পৃথিবী ছাড়াও তো আরো অনেক গ্রহ আছে যেখানে এক সময় মানুষ ছিল, এখন নেই। এখন শুধু গাছ।'

'গাছদের জন্যে এটা তো ভালোই, তাই নয় কি তিন্নি? শুধু ওরা থাকবে, আর কেউ থাকবে না।'

তিন্নি দীর্ঘ সময় চুপ করে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'না, ভালো না। ওরা সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চায়। সারা জীবনে ওরা যত জ্ঞান লাভ করেছে, এগুলি মানুষকে বলতে চায়। কিন্তু বলার আগেই মানুষ শেষ হয়ে যায়। ওরা বলতে পারে না। এই জন্যে ওদের খুব কষ্ট।'

'মানুষকে ওরা ওদের কথা বলতে পারছে না কেন?'

'বলতে পারছে না, কারণ মানুষ তো এখনো খুব উন্নত হয় নি। ওদের অনেক উন্নত হতে হবে। কিন্তু তা হবার আগেই তো ওরা শেষ হয়ে যায়।'

'এইসব কথা কি তোমার আশেপাশের গাছদের কাছ থেকে জানলে?'

'না। অন্য গাছ আমাকে বলেছে। আমি যখন ঘুমিয়ে থাকি, তখন ওরা বলে।'

'তুমি যে-সব গাছের ছবি আঁক, সেইসব গাছ?'

তিন্নি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। বুড়ো চাওয়ালা বলল, 'শইলডা কি অখন ঠিক হইছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। যাই বুড়োমিয়া।'

'কাইল আবার আইসেন।'

'না, কাল আসতে পারব না। কাল আমি ঢাকা চলে যাব। আবার যখন আসব, তখন কথা হবে।'

বরকত সাহেবের সঙ্গে দেখা হল চায়ের টেবিলে। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। ভালোমতো চোখ তুলে তাকাচ্ছেন না। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে মিসির আলির উপর বেশ বিরক্ত। মিসির আলি এই বিরক্তির কারণ ঠিক ধরতে পারলেন না। মিসির আলি বললেন, 'আপনার শরীর কেমন?'

'আমার শরীর ভালোই। আমার শরীর খারাপ হওয়ার তো কোনো কারণ ঘটে নি।

আপনি ঢাকায় এত দিন কী করলেন?'

'তেমন কিছু করতে পারি নি, খোঁজখবর করছি।'

'খোঁজখবর তো যথেষ্টই করা হল, আর কত?'

'আপনি মনে হয় আশা ছেড়ে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, ছেড়ে দিয়েছি। এই সমস্যার কোনো সমাধান নেই। আপনি অনেক চেষ্টা করেছেন। সেই জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার পারিশ্রমিক হিসেবে আমি একটি চেক আপনার জন্যে তৈরি করে রেখেছি, নিজাম আপনাকে দেবে। আমি চাই না এ-ব্যাপারটি নিয়ে আপনি আর মাথা ঘামান।'

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'ভাগ্যকে স্বীকার করে নেবার চেষ্টা করছি। যা ঘটেছে, এটা আমার ভাগ্য।'

'ভাগ্যটা কী জানতে পারি কি?'

'না, জানতে পারেন না। আমি ঐ সব নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাই না। সমস্ত ব্যাপারটা থেকে আমি হাত ধুয়ে ফেলতে চাই।'

মিসির আলি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'গোড়া থেকেই আপনি অনেক কিছু আমার কাছ থেকে গোপন করেছেন, যেটা উচিত হয় নি।'

বরকত সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমি ধারণা করেছিলাম আপনি নিজেই তা ধরতে পারবেন। এখন দেখছি আমার ধারণা ঠিক নয়। আপনি কিছুই ধরতে পারেন নি।

'একেবারেই যে ধরতে পারি নি, তা নয়। আমার ধারণা, আপনার স্ত্রী আপনাকে বলে গিয়েছিলেন, তিন্নি মেয়েটি বড় হলে কেমন হবে। অর্থাৎ আজকের এই সমস্যার ব্যাপারটি সম্পর্কে আপনার স্ত্রী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।'

'এই জাতীয় ধারণা হবার পেছনে আপনার যুক্তি কী?'

'যুক্তি অবশ্যই আছে। এবং বেশ কঠিন যুক্তি।'

'বলুন, শুনি আপনার কঠিন যুক্তি।'

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। বরকত সাহেবের চোখের দিকে তাকালেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। এবং শান্ত স্বরে বললেন, 'আমি প্রথমেই লক্ষ করলাম, আপনি আপনার মেয়ের অস্বাভাবিকতাগুলি মোটামুটি সহজভাবেই গ্রহণ করেছেন, তেমন বিচলিত হন নি। আমাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে জানান নি। এ থেকেই মনে হয়েছে, আপনার মেয়ের এইসব অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে আপনি মানসিকভাবে প্রস্তুত। এই প্রস্তুতি কোথেকে আসতে পারে? আমার মনে হয়েছে কেউ নিশ্চয় আগেই আপনাকে বলেছে। কে বলতে পারে? আমার মনে হয়েছে আপনার স্ত্রীর কথা। কারণ আপনার স্ত্রী হচ্ছেন—'

বরকত সাহেব মিসির আলির কথা শেষ করতে দিলেন না। উঠে দাঁড়ালেন এবং কঠিন স্বরে বললেন, 'আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে, আপনি এখন যান, পরে কথা বলব।'

মিসির আলি নিঃশব্দে উঠে এলেন। চলে গেলেন বাগানে। বড়ই গাছটি খুঁজে বের করবেন। তিন্নি বড়ই গাছের একটা গর্তে দাঁড়িয়ে থাকে, ঐ গর্তটিও পরীক্ষা করে দেখবেন। কিন্তু সেই সুযোগ হল না। ভয়াবহ একটি ব্যাপার ঘটল। প্রকাণ্ড একটা ময়াল সাপ হঠাৎ যেন আকাশ ফুঁড়ে নেমে এল। মিসির আলি চমকে উঠলেন। তাঁর চোখ থেকে চশমা খুলে পড়ল, আর ঠিক তখন মনে হল--এই দৃশ্যটি সত্যি নয়।

ময়মনসিংহ শহরের একটি বাড়িতে এত বড় একটি ময়াল এসে উপস্থিত হতে পারে না। তা ছাড়া কোনো সাপ পেটে ভর দিয়ে নিজের মাথাটা এত উঁচুতে তুলতে পারে না। এই দৃশ্যটি নিশ্চয়ই তিন্নির তৈরি করা। মেয়েটি এই ছবি দেখাচ্ছে। মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন, আর ঠিক তখন তিন্নির হাসি শোনা গেল। মেয়েটি তার ঘরে বসেই হাসছে, তিনি শুনতে পাচ্ছেন। তিন্নির হাসি থামল। সে রিনরিনে গলায় বলল, 'খুব ভয় পেয়েছেন?'

'তা পেয়েছি।'

'কিন্তু যতটা ভয় পাবেন ভেবেছিলাম, ততটা পান নি। আপনি বুঝে ফেলেছেন যে এটা মিথ্যা সাপ।'

'হ্যাঁ, তাও ঠিক।'

'আপনার এত বুদ্ধি কেন বলুন তো?'

'জানি না।'

'সব মানুষের যদি আপনার মতো বুদ্ধি হত, তাহলে খুব ভালো হত। তাই না?'

মিসির আলি হেসে ফেললেন। হাসি থামিয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'তুমি আমাকে ভয় দেখালে কেন?'

'আপনি বলুন কেন। আপনার এত বুদ্ধি, আর এই সহজ জিনিসটা বলতে পারবেন না?'

'আন্দাজ করতে পারছি। তুমি চাও না আমি ঐ গর্তটি দেখি, যেখানে তুমি রোজ দাঁড়াও। তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'দেখ তিন্নি, আমি তোমার ব্যাপারটা বুঝতে চাই। কিন্তু তুমি আমাকে বুঝতে দিচ্ছ না। তুমি আমাকে সাহায্য না করলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না। আমার এত ক্ষমতা নেই।'

তিন্নি ক্লান্ত গলায় বলল, 'কোনো মানুষ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। যারা পারত, তারা করবে না।'

'কারা পারত?'

তিন্নি জবাব দিল না।

মিসির আলির মনে হল, মেয়েটি কাঁদছে।

১১

মিসির আলি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দরজায় খুটখুট শব্দ শুনে জেগে উঠলেন। অনেক রাত। ঘড়ির ছোট কাঁটা একের ঘর পার হয়ে এসেছে। তিনি মৃদু স্বরে বললেন, 'কে?' কোনো জবাব এল না। কিন্তু দরজার কড়া নড়ল; মিসির আলি অবাক হয়ে দরজা খুললেন। অন্ধকারে বরকত সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন।

'সরি, আপনার ঘুম ভাঙালাম বোধহয়।'

'কোনো অসুবিধা নেই, আপনি আসুন।'

বরকত সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'ঘুম আসছিল না, ভাবলাম আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করি।'

'খুব ভালো করেছেন। বসুন।'

বরকত সাহেব বসলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। বসে আছেন মাথা নিচু করে। এক জন অহঙ্কারী লোক এভাবে কখনো বসে না। মিসির আলি বললেন, 'আমার মনে হয়, আপনি আপনার স্ত্রীর কথা কিছু বলতে চান। বলুন, আমি শুনছি।'

বরকত সাহেব চুপ করে রইলেন। তাঁর মাথা আরো একটু ঝুঁকে পড়ল। মিসির আলি বললেন, 'আমি বরং বাতি নিভিয়ে দিই, তাতে কথা বলতে আপনার সুবিধা হবে। আলোতে আমরা অনেক কথা বলতে পারি না। অন্ধকারে সহজে বলতে পারি।'

বাতি নেভাবার পর ঘর কেমন অন্য রকম হয়ে গেল। গা ছমছম করতে লাগল। যেন এই ঘরটি এত দিনের চেনা কোনো ঘর নয়। অন্য কোনো রহস্যময় অচেনা ঘর। বরকত সাহেব সিগারেট ধরিয়ে মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন, 'আমার স্ত্রী খুবই সহজ এবং সাধারণ একজন মহিলা। বলার মতো তেমন কোনো বিশেষত্ব তার নেই। কোনো রকম অস্বাভাবিকতাও তার চরিত্রে ছিল না। তবে আমার শাশুড়ি এক জন অস্বাভাবিক মহিলা ছিলেন। বিয়ের আগে তা জানতে পারি নি। জেনেছি বিয়ের অনেক পরে।

'আমার স্ত্রীর জন্মের পরপর আমার শাশুড়ি মারা যান। আমার শাশুড়ি সম্পর্কে এখন আপনাকে যা বলছি, সবই শোনা কথা। আমার স্ত্রীর জন্মের ঠিক আগে আগে আমার শাশুড়ি অদ্ভুত আচার-আচরণ করতে থাকেন। তার ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে রোদে বসে থাকা। এখন তিন্নি যা করে, অনেকটা তাই। আমার শাশুড়ি লোকজনদের বলতে শুরু করেন, তাঁর পেটে মানুষের বাচ্চা নয়, তাঁর পেটে বড় হচ্ছে একটা গাছ। সবাই বুঝল এটা মাথা-খারাপের লক্ষণ। গ্রাম্য চিকিৎসাটিকিৎসা হতে থাকল। কোনো লাভ হল না। তিনি বলতেই থাকলেন, তাঁর পেটে বড় হচ্ছে একটা গাছ। যাই হোক, যথাসময়ে আমার স্ত্রীর জন্ম হল—ফুটফুটে একটি মেয়ে। আমার শাশুড়ি মেয়েকে কোলে নিলেন, কিন্তু বললেন, 'তোমরা বুঝতে পারছ না, এ আসলে মানুষ নয়, এ একটা গাছ।' এর কিছু দিন পর আমার শাশুড়ি মারা যান।

আপনাকে আগেই বলেছি, আমার স্ত্রী খুব স্বাভাবিক মহিলা ছিল। কিন্তু তিন্নি যখন পেটে এল, তখন তার ভেতরেও অস্বাভাবিকতা দেখা দিল। এক রাতে সে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলল, 'তার পেটে যে বড় হচ্ছে, সে মানুষ নয়, সে একটা গাছ।' আমি এমন ভাব দেখালাম যে, এই খবরে মোটেও অবাক হই নি। আমি বললাম, 'তাই কি?'

সে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কী করে বুঝলে?'

'অনেক দূরের কিছু গাছ আমাকে স্বপ্নে বলেছে। তারা বলেছে, তোমার গর্ভে যে জন্মেছে, তাকে খুব যত্নে বড় করবে। কারণ তাকে আমাদের খুব দরকার।'

'স্বপ্নে তো মানুষ অনেক কিছুই দেখে। স্বপ্নটাকে কখনো সত্যি মনে করতে নেই।'

'এটা সত্যি। এটা স্বপ্ন নয়।'

'ঠিক আছে, সত্যি হলে সত্যি। এখন ঘুমাও।'

তিন্নির জন্মের কিছু দিন পর আমার স্ত্রী মারা গেল। তার মৃত্যুর দু' দিন আগে তিন্নিকে কোলে নিয়ে আমি তার কাছে গেলাম। হাসিমুখে বললাম, 'কী সুন্দর একটি মেয়ে, তুমি বলছ গাছ?'

আমার স্ত্রী ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল। শান্ত স্বরে বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না। কিন্তু একদিন বুঝবে।' আমি হাসতে-হাসতে বললাম, 'এক দিন সকালবেলা দেখব তিন্নির চারদিকে ডালপালা গজিয়েছে, নতুন পাতা ছেড়েছে?'

আমার স্ত্রী তার জবাব দিল না। কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। যেন আমার কথায় সে অসম্ভব রেগে গেছে।

বরকত সাহেব থামলেন। ঘর অন্ধকার, কিন্তু মিসির আলি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, ভদ্রলোকের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

'আপনি আমার স্ত্রী সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন। আমি যা জানি আপনাকে বললাম। এখন আপনি আমাকে বলুন, কী হচ্ছে?'

মিসির আলি কি বলবেন ভেবে পেলেন না। বরকত সাহেব ধরা গলায় বললেন, 'কিছু দিন থেকে তিন্নি বাগানে একটি গর্তে চুপচাপ ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে। ফিরে আসে অনেক রাতে। আমার প্রায়ই মনে হয়, একদিন সে হয়তো আর ফিরবে না। সেখানেই থেকে যাবে এবং দেখব—'

বরকত সাহেব কথা শেষ করলেন না। তাঁর গলা বন্ধ হয়ে এল। মিসির আলি বললেন, 'নিন, এক গ্লাস পানি খান।' বরকত সাহেব তৃষ্ণার্তের মতো পানির গ্লাস শেষ করলেন।

'মিসির আলি সাহেব।'

'জ্বি বলুন।'

'তিন্নি এখন আমাকে বলছে বাড়ি ছেড়ে যেতে। সে একা থাকবে এখানে। কাজের লোক থাকবে না, দারোয়ান মালী কেউ থাকবে না। থাকবে শুধু সে একা। এবং আপনি জানেন মেয়েটি যা চায়, তাই আমাকে করতে হবে। ওর অসম্ভব ক্ষমতা। আপনি তার পরিচয় ইতোমধ্যেই হয়তো পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ, তা পেয়েছি।'

'কী হচ্ছে আপনি আমাকে বলুন, এবং আমি কী করব, সেটা আমাকে বলুন। আমার শরীরও বেশি ভালো না। ব্লাড প্রেশার আছে, ইদানীং সুগারের প্রবলেম দেখা দিয়েছে। রাতের পর রাত ঘুমুতে পারি না।'

মিসির আলি দৃঢ় গলায় বললেন, 'হাল ছেড়ে দেবার মতো এখনো কিছু হয় নি।'

'হালই তো নেই। হাল ধরবেন কীভাবে?'

বরকত সাহেব উঠে পড়লেন। বাকি রাতটা মিসির আলি জেগেই কাটালেন। অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে সমস্ত ব্যাপারটা গোছাতে চেষ্টা করলেন। 'জিগ স পাজল্' একটির সঙ্গে অন্যটি কিছুতেই মেলে না। তবু কি কিছু একটা দাঁড় করান যায় না?

একটা পর্যায়ে জীবনকে প্রকৃতি দু' ভাগে ভাগ করলেন--প্রাণী এবং উদ্ভিদ। প্রাণীরা ঘুরে বেড়াতে পারে, উদ্ভিদ পারে না। পরবর্তী সময়ে প্রাণের বিকাশ হল। ক্রমে

–ক্রমে জন্ম হল অসাধারণ মেধাসম্পন্ন প্রাণীর––মানুষ। এই বিকাশ শুধু প্রাণীর ক্ষেত্রে হবে কেন? কেন উদ্ভিদের বেলায়ও হবে না?

ধরা যাক উদ্ভিদের বেলায়ও বিকাশ হল। এক সময় জন্ম হল এমন এক শ্রেণীর উদ্ভিদ, অসাধারণ যাদের মেধা। এই পৃথিবীতে হয়তো হল না, হল অন্য কোনো গ্রহে। একটি উন্নত প্রাণী খুঁজে বেড়াবে অন্য উন্নত জীবনকে। কারণ তারা চাইবে, তাদের আহরিত জ্ঞান অন্যকে জানাতে। তখন তারা কি চেষ্টা করবে না ভিন্ জাতীয় প্রাণের সঙ্গে যোগাযোগের? সেই যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে এমন একটি 'প্রাণ' তার দরকার, যে একই সঙ্গে মানুষ এবং উদ্ভিদ। এ জাতীয় একটি প্রাণ সে তৈরি করতে চেষ্টা করবে। তার জন্যে তাকে ডিএনএ অণুর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। প্রথম পরীক্ষাতেই সে তা পারবে না। পরীক্ষাটি তাকে করতে হবে বারবার।

তিন্নি কি এ রকম একজন কেউ? মহাজ্ঞানী উদ্ভিদগোষ্ঠীর পরীক্ষার একটি বস্তু? মানুষ যদি উদ্ভিদ নিয়ে, ইঁদুর নিয়ে ল্যাবরেটরিতে নানান ধরনের পরীক্ষা করতে পারে––ওরা কেন পারবে না?

কিন্তু তারা পরীক্ষাটা করছে কীভাবে? এক জন মানুষ ল্যাবরেটরিতে ইঁদুরের গায়ে একটি সিরিঞ্জে করে রিএজেন্ট ঢুকিয়ে দিতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদ কি তা পারবে?

হয়তো পারবে। মাইক্রোওয়েভ রশ্মি দিয়ে আমরা দূর থেকে যন্ত্র চালু করতে পারি। ওদের হাতেও হয়তো তেমন ব্যবস্থা আছে।

মিসির আলি বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এসে বসলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছে। বাগানটিকে ভারি সুন্দর লাগছে। এত সুন্দর যে মন খারাপ হয়ে যায়।

'আপনি আজ আর ঘুমুলেন না, তাই না?'

মিসির আলি চমকে উঠলেন। তিন্নির গলা।

'তুমিও তো দেখছি জেগে আছ।'

'হ্যাঁ, আমি জেগেই থাকি।'

মিসির আলি কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। এ জাতীয় কথাবার্তায় তিনি এখন অভ্যস্ত। আগের মতো অস্বস্তি বোধ হয় না। বরঞ্চ মনে হয়, এই তো স্বাভাবিক। বরঞ্চ কথা বলার এই পদ্ধতি অনেক সুন্দর। মুখোমুখি এসে বসার দরকার নেই। দু' জন দু' জায়গায় থেকে কথা বলে চমৎকার সময় কাটান।

'তিন্নি, আমি যে এতক্ষণ তোমার বাবার সঙ্গে গল্প করলাম–– সেটা কি তুমি জান?'

'হ্যাঁ, জানি। সব কথা শুনেছি।'

'আমি তোমাকে নিয়ে যা ভেবেছি, তাও নিশ্চয়ই জান?

'হ্যাঁ, তাও জানি। সব জানি।

'আমি কি ঠিক পথে এগুচ্ছি? অর্থাৎ আমার থিওরি কি ঠিক আছে?'

'কিছু–কিছু ঠিক। বেশির ভাগই ঠিক না।'

'কোন জিনিসগুলি ঠিক না, সেটা কি আমাকে বলবে?'

'না, বলব না।'

'কেন বলবে না?'

তিন্নি জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, 'তুমি কি চাও না, আমি তোমাকে সাহায্য করি?'

'না, চাই না।'

'এক সময় কিন্তু চেয়েছিলে।'

'তখন খুব ভয় লাগত, এখন লাগে না।'

মিসির আলি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর খুব শান্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বুঝতে পারছ, তোমার মধ্যে একটা পরিবর্তন হচ্ছে। তুমি বদলে যাচ্ছ। শেষ পর্যন্ত কী হবে তুমি কি জান?'

'জানি।'

'তুমি কি আমাকে তা বলবে?'

'না।'

'আচ্ছা, এইটুকু বল, তুমি কি একমাত্র মানুষ, যার উপর এই পরীক্ষাটি হচ্ছে? না তুমি ছাড়াও আরো অনেককে নিয়ে এ রকম হয়েছে বা হচ্ছে?'

'অনেককে নিয়েই হয়েছে এবং হচ্ছে। এবং, এবং—'

'বল, আমি শুনছি।'

'এমন একদিন আসবে, পৃথিবীর সব মানুষ এ-রকম হয়ে যাবে।'

'তার মানে!'

'তখন কত ভালো হবে, তাই না? মানুষের কোনো খাবারের কষ্ট থাকবে না। মানুষ কত উন্নত প্রাণী, কিন্তু সে তার সবটা সময় নষ্ট করে খাবারের চিন্তায়। এই সময়টা সে নষ্ট করবে না। কত জিনিস সে জানবে। আরো কত ক্ষমতা হবে তার।'

'কী হবে এত কিছু জেনে?'

তিন্নি খিলখিল করে হেসে উঠল।

মিসির আলি বললেন, 'হাসছ কেন?'

'হাসি আসছে, তাই হাসছি। মানুষ তো এখনো কিছুই জানে না, আর আপনি বলছেন, কী হবে এত জেনে।'

'তুমি বুঝি অনেক কিছু জেনে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কি কি জানলে বল।'

'তা বলব না। আপনি এখন ঘুমুতে যান।'

'আমার ঘুম পাচ্ছে না, আমি আরো কিছুক্ষণ কথা বলব তোমার সঙ্গে।'

'না, আপনি আর কথা বলবেন না। আপনি এখন ঘুমুবেন এবং সকালে উঠে ঢাকা চলে যাবেন। আর কখনো আসবেন না।'

'আসব না মানে?'

'ইচ্ছা করলেও আসতে পারবেন না। আমার কথা কিছুই আপনার মনে থাকবে না।'

'কী বলছ তুমি!'

'আপনাকে আমার দরকার নেই।'

তিন্নি হাসতে লাগল। মিসির আলি সারা রাত বারান্দায় বসে রইলেন। অস্পষ্ট-

ভাবে তাঁর মনে হতে লাগল, মেয়েটি যা বলছে, তা-ই হবে।

মানুষ যখন কোনো জটিল এক্সপেরিমেন্ট করে, তার সাবধানতার সীমা থাকে না। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, যেন তার এক্সপেরিমেন্ট নষ্ট না হয়। কেউ এসে যেন তা ভণ্ডুল না করে দেয়। যারা এই ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে এই ভয়াবহ এক্সপেরিমেন্ট করছে, তারাও তাই করবে। কে রক্ষা করবে মেয়েটিকে?

ভোররাতের দিকে মিসির আলির শরীর খারাপ লাগতে লাগল। তাঁর কেবলি মনে হল, ঢাকায় কী যেন একটা কাজ ফেলে এসেছেন। খুব জরুরি কাজ। এক্ষুণি ফিরে যাওয়া দরকার। কিন্তু কাজটি কী, তা মনে পড়ছে না। তিনি সকাল আটটায় ঢাকা রওনা হয়ে গেলেন। বরকত সাহেব বা তিন্নি--কারো কাছ থেকে বিদায় পর্যন্ত নিলেন না। তিন্নির ব্যাপারটা নিয়ে বড়-বড় খাতায় গাদাগাদা নোট করেছিলেন। সব ফেলে গেলেন, কিছুই সঙ্গে নিলেন না। ঢাকায় পৌছার আগেই প্রচণ্ড জ্বরে জ্ঞান হারালেন।

ট্রেনের এক জন সহযাত্রী দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে পৌছে দিলেন ঢাকা মেডিকেলে। তিনি প্রায় দু' মাস অসুখে ভুগলেন, সময়টা কাটল একটা ঘোরের মধ্যে। পুরোপুরি সুস্থ হতে তাঁর আরো দু' মাস লাগল। কিন্তু পুরোপুরি বোধহয় সুস্থ হলেনও না। কিছু কিছু জিনিস তিনি মনে করতে পারেন না। যেমন এক দিন অমিতা তাঁকে দেখতে এসে বলল, 'শুধু শুধু আজেবাজে কাজে ছোটাছুটি কর, তারপর একটা অসুখ বাধাও। সেইবার হঠাৎ কুমিল্লা এসে উপস্থিত। যেভাবে হঠাৎ আসা, সেইভাবে হঠাৎ বিদায়। আমি তো ভেবেই পাই না--।'

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'কুমিল্লা! কুমিল্লা কেন যাব!'

'সে কী, তোমার মনে নেই!'

'না তো।'

'তুমি মামা একটা বিয়েটিয়ে করে সংসারী হও।'

নিউমার্কেটে বইয়ের দোকানে এক বার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি রাগী গলায় বললেন, 'যাক, আপনার দেখা পাওয়া গেল। বইগুলি তো ফেরত দিলেন না, কেন?'

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'কী বই?'

'কী বই মানে! বোটানির দু'টি বই নিয়ে গেলেন না আমার কাছ থেকে?'

'তাই নাকি?'

'আবার বলছেন তাই নাকি। আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি ডঃ জাবেদ।'

'না, আমি তো ঠিক----।'

মিসির আলি খুবই বিব্রত বোধ করলেন, কিন্তু কিছুই করার নেই। এর প্রায় এক বৎসর পর মিসির আলি ময়মনসিংহের এক অ্যাডভোকেটের কাছ থেকে এক চিঠি পেলেন। চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে বরকতউল্লাহ্ নামের এক ব্যবসায়ী ময়মনসিংহ শহরের বাড়ি মিসির আলিকে দান করেছেন। বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কিছু টাকাও ব্যাঙ্কে জমা আছে। টাকার অঙ্কটি অবশ্য উল্লেখ করা হয় নি। মিসির আলি ভেবেই পেলেন না, অপরিচিত এক ভদ্রলোক শুধু-শুধু তাঁকে বাড়ি দেবেন কেন।

সেই বাড়ি দেখেও তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। বিশাল বাড়ি। অ্যাডভোকেট

ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বললেন, 'বাড়ি অনেক দিন তালাবন্ধ আছে। বাগানের অবস্থা দেখেন না, জঙ্গল হয়ে আছে!'

মিসির আলি বললেন, 'আমাকে বাড়িটা কেন দেওয়া হয়েছে, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক বিরক্ত মুখভঙ্গি করলেন। মোটা গলায় বললেন, 'দিচ্ছে যখন নিন। ইচ্ছা করলে বিক্রি করে দিতে পারেন। ভালো দাম পাবেন। আমার কাছে কাস্টমার আছে--ক্যাশ টাকা দেবে।'

মিসির আলি বাড়ি বিক্রি করার ব্যাপারে তেমন কোনো আগ্রহ দেখালেন না। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আগে দেখি, বাড়িটা আমাকে কেন দেয়া হল। আজকালকার দিনে কেউ তো আর শুধু-শুধু এ-রকম দান খয়রাত করে না! দানপত্রে কি কিছুই লেখা নেই?'

'তেমন কিছু না, শুধু বাগানের প্রতিটি গাছের যথাসম্ভব যত্ন নেবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। উইলের কপি তো পাঠিয়েছি আমি আপনাকে।'

মিসির আলি বাড়ি তালাবন্ধ করে ঢাকা ফিরে এলেন। বরকতউল্লাহ্ লোকটি সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জোগাড় করলেন। জানতে পারলেন যে, এর একটি অসুস্থ মেয়ে ছিল। মেয়েটির মাথার ঠিক ছিল না। মেয়েটি মারা যাবার পর ঐ বাড়ির কম্পাউন্ডের ভেতরই তার কবর হয়। ভদ্রলোক নিজেও অল্প দিন পর মারা যান। কিন্তু এর সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক? মিসির আলি বড়ই অবাক হলেন। জগতে রহস্যময় ব্যাপার এখনো তাহলে ঘটে!

১২

পাঁচ বছর পরের কথা।

মিসির আলি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ময়মনসিংহে বেড়াতে এসেছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম নীলু, হাসিখুশি ধরনের একটি মেয়ে। খুব সহজেই অবাক হয়, অল্পতেই মন-খারাপ করে, আবার সামান্য কারণেই মন ভালো হয়ে যায়।

ময়মনসিংহে আসার নীলুর কোনো ইচ্ছা ছিল না। আসতে হয়েছে মিসির আলির আগ্রহে। তিনি বারবার বলেছেন, 'তোমাকে মজার একটা জিনিস দেখাব।' অনেক চেষ্টা করেও সেই মজার জিনিসটি সম্পর্কে নীলু কিছু জানতে পারে নি। মিসির আলি লোকটি কথা খুব কম বলেন। তিনি প্রশ্নের উত্তরে শুধু হেসে বলেছেন, 'গেলেই দেখবে। খুব অবাক হবে।'

নীলু সত্যি অবাক হল। চোখ কপালে তুলে বলল, 'এই বাড়িটা তোমার! বল কী! কে তোমাকে এই বাড়ি দিয়েছে?'

'দিতে হবে কেন, আমি বুঝি কিনতে পারি না?'

'না, পার না। তোমার এত টাকাই নেই।'

'বরকত সাহেব বলে এক ভদ্রলোক দিয়েছেন।'

'কেন দিয়েছেন?'

'ঐটা একটা রহস্য। রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছি। যখন করব, তখন জানবে।'

গভীর আগ্রহে নীলু বিশাল বাড়িটি ঘুরে-ঘুরে দেখল। বহু দিন এখানে কেউ ঢোকে নি, ভ্যাপসা, পুরোনো গন্ধ। দেয়ালে ঘন ঝুল। আসবাবপত্রে ধুলোর আস্তরণ। বাগানে ঘাস হয়েছে হাঁটু-উঁচু। পেছন দিকটায় কচু গাছের জঙ্গল। মিসির আলি বললেন, 'এ তো দেখছি ভয়াবহ অবস্থা!'

নীলু বলল, 'যত ভয়াবহই হোক, আমার খুব ভালো লাগছে। বেশ কিছু দিন আমি এ বাড়িতে থাকব, কি বল?'

'কী যে বল! এ-বাড়ি এখন মানুষ-বাসের অযোগ্য। মাস দু'-এক লাগবে বাসের যোগ্য করতে।'

'তুমি দেখ না কী করি!'

কোমর বেঁধে ঘর গোছাতে লাগল নীলু। তার প্রবল উৎসাহ দেখে মিসির আলির কিছু বলতে মায়া লাগল। যেন এই মেয়েটি দীর্ঘ দিন পর নিজের ঘর-সংসার পেয়েছে। আনন্দে-উৎসাহে ঝলমল করছে। এক দিনের ভেতর মালী লাগিয়ে বাগান পরিষ্কার করল। বাজার থেকে চাল-ডাল কিনে রান্নার ব্যবস্থা করল। রাতে খাবার সময় চোখ বড়-বড় করে বলল, 'জান, এ বাড়ির ছাদ থেকে পাহাড় দেখা যায়। নীল পাহাড়ের সারি। কী যে অবাক হয়েছি পাহাড় দেখে!'

পাহাড়ের নাম হচ্ছে "গারো পাহাড়"।

'আজ অনেকক্ষণ ছাদে দাঁড়িয়ে পাহাড় দেখলাম। মালী বাগানে কাজ করছিল, আমি পাহাড় দেখছিলাম।'

'ভালো করেছ।'

'ও ভালো কথা, বাগানে খুব অদ্ভুত ধরনের একটা গাছ আছে। ভোরবেলা তোমাকে দেখাব। কোনো অর্কিড-টর্কিড হবে। হলুদ রঙের লতানো গাছ। মেয়েদের চুলে যে রকম বেণী থাকে, সে রকম বেণী-করা। নীল-নীল ফুল ফুটেছে।'

মিসির আলি তেমন কোনো উৎসাহ দেখালেন না। নীলু বলল, 'আচ্ছা, এই বাড়িতে থেকে গেলে কেমন হয়?'

'কী যে বল! ঢাকায় কাজকর্ম ছেড়ে এখানে থাকব?'

'আমি থাকি। তুমি সপ্তাহে-সপ্তাহে আসবে।'

'পাগল হয়েছ নাকি? একা-একা তুমি এখানে থাকবে?'

'আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমার এ-বাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'প্রথম প্রথম এ-রকম মনে হচ্ছে। ক'দিন পর আর ভালো লাগবে না।'

'আমার কখনো এ বাড়ি খারাপ লাগবে না। যদি হাজার বছর থাকি তবুও লাগবে না।'

'আচ্ছা, দেখা যাবে।'

'দেখো তুমি।'

আসলেই তাই হল। মিসির আলি লক্ষ করলেন, এ-বাড়ি যেন প্রবল মায়ায় বেঁধে ফেলেছে নীলুকে। ছুটিছাটা হলেই সে ময়মনসিংহ আসবার জন্যে অস্থির হয়। এক বার এলে আর কিছুতেই ফিরে আসতে চায় না। রীতিমতো কান্নাকাটি করে। বিরক্ত হয়ে মাঝে-মাঝে তাকে একা রেখেও চলে এসেছেন। ভেবেছেন ক' দিন একা থাকলে আর

থাকতে চাইবে না। কিন্তু তা হয় নি। এ বিচিত্র বাড়িটির প্রতি নীলুর আকর্ষণ বাড়তেই থাকল। শেষটায় এ রকম হল যে, বৎসরের প্রায় অর্ধেক সময় তাদের কাটে এই বাড়িতে।

থাকলে আর থাকতে চাইবে না। কিন্তু তা হয় নি। এ বিচিত্র বাড়িটির প্রতি নীলুর আকর্ষণ বাড়তেই থাকল। শেষটায় এ-রকম হল যে, বৎসরের প্রায় অর্ধেক সময় তাদের কাটে এই বাড়িতে।

তাদের প্রথম ছেলেটির জন্মও হল এ-বাড়িতে। ঠিক তখন মিসির আলি লক্ষ করলেন, নীলু যেন পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়। এক দিন কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে বলল, 'জান আমাদের এ ছেলেটা আসলে একটা গাছ।'

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'এ-কথা বলছ কেন?'

নীলু লজ্জিত স্বরে বলল, 'এমনি বললাম, ঠাট্টা করলাম।'

'এ কেমন অদ্ভুত ঠাট্টা!'

নীলু উঠে চলে গেল। মিসির আলি দেখলেন, সে ছাদে দাঁড়িয়ে দূরের গারো পাহাড়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার চোখ ভেজা।

সেই অজানা লতানো গাছটি আরো লতা ছেড়ে অনেক বড় হয়েছে। প্রচুর ফুল ফুটিয়েছে। দিনের বেলা সে-ফুলের কোনো গন্ধ পাওয়া যায় না, কিন্তু যতই রাত বাড়ে—মিষ্টি সুবাসে বাড়ি ভরে যায়। মিসির আলির অস্বস্তি বোধ হয়। কিন্তু অস্বস্তির কারণ তিনি ধরতে পারেন না।

তিনি তাঁর ছেলেকে নিয়েও খুব দুশ্চিন্তা বোধ করেন। ছেলেটি সবে হামা দিতে শিখেছে। সে ফাঁক পেলেই হামা দিয়ে ছাদে উঠে যায়। চুপচাপ রোদে বসে থাকে। তাকে নামিয়ে আনতে গেলেই হাত-পা ছুঁড়ে বড্ড কান্নাকাটি করে।